নীল কাগজের ফুল

অভীক দত্ত

পর্ব ১

১

চাঁদ উঠেছে।

এরকম চাঁদ অনেক দিন পর উঠল। সুন্দর লাগছে দেখতে।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতর।

জিনিয়ার ঘরের জানলাটা বড়ো। চাঁদ দেখার জন্য আদর্শ। সে বিভোর হয়ে চাঁদ দেখছে। দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

সৌপ্তিক চলে যাওয়ার এক মাস হয়ে গেল। তবু সে কিছুতেই সৌপ্তিককে ভুলতে পারছে না। কিছু কিছু জিনিস থাকে, যা সব মনে করিয়ে দেয়।

এই যেমন চাঁদ।

চাঁদ উঠলেই সৌপ্তিক মেসেজ করত, "চাঁদ দেখছ?"

জিনিয়া হয়তো তখন কোনও কাজ করছে। বিরক্ত হয়ে লিখত, "আমার কি অন্য কোনও কাজ নেই?"

সৌপ্তিক লিখত, "প্লিজ, একবার দেখে তারপর নাহয় কাজ করো।"

জিনিয়ার মনটা তখন খচখচ করতে শুরু করত। চাঁদ না দেখা অবধি শান্তি মিলত না।

এখন চাঁদই দেখছে সে। অথচ সৌপ্তিক নেই।

ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পাওয়ার পরেও বিশ্বাস হচ্ছিল না জিনিয়ার। বারবার সৌপ্তিকের মোবাইলে ফোন করে যাচ্ছিল। ফোনটা নট রিচেবল বলে যাচ্ছিল।

এখনও সৌপ্তিকের ফেসবুক প্রোফাইলটা আছে। থাকবে আজীবন।

জিনিয়ার ফার্স্ট সিন করা ছিল সৌপ্তিকের সব আপডেট। এখন কোনও আপডেট আসে না। কিচ্ছু আসে না। সব শেষ হয়ে গেছে।

মালতী এসে ঘরের আলো জ্বালালেন। ক্লান্ত মুখে তার খাটে বসে বললেন, "মশা মারার কয়েলটা তো দিবি। মশার কামড় খেতে ভাল্লাগে?"

জিনিয়া উত্তর দিল না।

মালতী একটু থমকে বললেন, “পৌলমী ফোন করেছিল। বলল একজন ভালো মনোবিদের সন্ধান পেয়েছে। যাবি?”

জিনিয়া বলল, “আমার মনোবিদের দরকার নেই। কিছুদিন সময় দরকার।”

মালতী বললেন, “সময় নিবি তো। অসুবিধা নেই। রুনু যে ছেলেটাকে আনবে বলছে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নে কাল।”

জিনিয়া মার দিকে তাকিয়ে বলল, “পারো কী করে মা? ক্লান্তি লাগে না? কষ্ট হয় না একটুও আমার জন্য? সৌপ্তিককে তো তুমিও চিনতে! চিনতে না?”

মালতী থতোমতো খেয়ে বললেন, “তোর কথা ভেবেই বলি মা। গোটা জীবনটা একা কাটাবি তা তো হয় না। তা ছাড়া বাবার রিটায়ারমেন্ট...”

জিনিয়া বলল, “ব্রহ্মাস্ত্র বারবার ব্যবহার করতে নেই, জানো না? ঠিক সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মনে রাখবে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র বাবার রিটায়ারমেন্ট। এটা বারবার বললে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।”

মালতী দুঃখী মুখে বসে থেকে বললেন, "আমার আর ভালো লাগে না। আমি আর পারছি না বিশ্বাস কর। একটু শান্তি কি আমি পাব না?"

জিনিয়া বলল, "পাবে। আমি মরলে শান্তি পাবে। খুশি?"

মালতী কেঁদে ফেললেন, "কেন বারবার আমাকেই বলিস বল তো এসব? আমি কী করব? তুই ভালো থাকিস, আমি চাইতে পারি না?"

জিনিয়া বলল, "অবশ্যই চাইতে পারো। একশোবার চাইতে পারো। তোমার চাওয়ার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলছি না। আমার শুধু একটাই কথা। আমার সময় চাই। দয়া করে সেটা দাও। এখনই সং সেজে ছেলেপক্ষের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে বেশ্যা মনে হয়। বেশ্যা মানে খারাপ অর্থে বলছি না কিন্তু। ওই যে রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, নিজেকে সেরকম লাগবে সেটা বলছি।"

মালতী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন, "আর কত আঘাত দিবি আমাকে দেখব। কিছু বলব না তোকে। দেখে যাব।"

জিনিয়া বলল, "আহত হওয়ার মতো কথা বোলো না। আমাকে একটু শান্তি দাও। ঠিক হয়ে যাবে। এরকমভাবে বারবার খোঁচালে সব আবার অগোছালো হয়ে যাবে। বোঝো দয়া করে।"

মালতী উঠলেন, "যাই। রান্নাবান্না দেখি। মশার কামড় খাস না।"

জিনিয়া কিছু বলল না।

মালতী বেরিয়ে গেলেন। জিনিয়ার আবার কান্না পেল। বালিশটায় মুখ গুঁজল। সৌপ্তিক সারাদিন ধরে তাকে একগাদা বস্তাপচা জোকস পাঠাত। মোবাইল খুলে সে জোকগুলো দেখতে লাগল। ভয়েস মেসেজগুলো একের পর এক শুনতে শুরু করল।

বালিশ ভিজে গেল চোখের জলে।

২

আদিদেব বাগানে জল দিচ্ছিলেন। রোহিণী বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন।

জিনিয়া গেট খুলে ঢুকল।

আদিদেব জিনিয়াকে দেখে ম্লান হাসলেন। জিনিয়া প্রত্যুত্তরে হাসল।

রোহিণী জিনিয়াকে দেখে বললেন, "আজ অফিস গেলে না?"

জিনিয়া রোহিণীর পাশে বসে বলল, “ছুটি নিয়েছি কাকিমা। কেমন আছ এখন?”

রোহিণী বললেন, “কেমন থাকা যায়?”

জিনিয়া চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। আদিদেবের গাছে জল দেওয়া হয়ে গেছিল।

জল বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলেন।

জিনিয়া বলল, “রান্নাবান্না কিছু করেছ কাকিমা?”

রোহিণী বললেন, “করব। দেখি কী করা যায়।”

আদিদেব বললেন, “তোমার বাবা মা কেমন আছেন জিনিয়া?”

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, “ভালো।”

আদিদেব বললেন, “তোমার ট্রমা? কেটেছে?”

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, “জানি না।”

রোহিণী আদিদেবকে বললেন, "এসব কথা কেন বলছ ওকে?"

আদিদেব বললেন, "আমরা যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, জিনিয়ারও একই ফিলিংস হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি নেই তো কোনও।"

জিনিয়া বলল, "না না, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি। শুধু মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বড্ড।"

আদিদেব বললেন, "সবখানেই এক ব্যাপার। সকালটা যাও বা কেটে যায়, রাত কাটতে চায় না।"

জিনিয়া বলল, "আমি একবার সৌপ্তিকের ঘরে যাই?"

আদিদেব ঘাড় নাড়লেন, "যাও।"

জিনিয়া উঠে সৌপ্তিকের ঘরে গেল।

সৌপ্তিক চলে যাওয়ার পর থেকে এ ঘরে এসে বসাটা কেমন নেশার মতো হয়ে যাচ্ছে তার। আলনায় সৌপ্তিকের জামা, চাদরে যেন এখনও সৌপ্তিকের গন্ধ লেগে আছে।

খাটে মাথা রেখে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল জিনিয়া।

সৌপ্তিকের সব কিছু আছে। অথচ সে-ই নেই।

মাথা কাজ করে না মাঝে মাঝে। সব এলোমেলো হয়ে যায়। পড়ার টেবিল। কম্পিউটার। ড্রয়ার।

রোহিণী এসে বললেন, “চা করছি। খাবে তো?”

জিনিয়া বলল, “খাব। আচ্ছা ওর ছোটোবেলার অ্যালবামটা দেবে আর-একবার?”

রোহিণী এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, “আচ্ছা। নিয়ে আসছি।”

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে ভারী যত্ন করে দেখতে শুরু করল জিনিয়া।

প্রথমবার যেদিন অ্যালবামটা দেখিয়েছিল সৌপ্তিক, সেদিন ওর জন্মদিন ছিল।

প্রতিটা ছবি দেখে কত হাসিঠাট্টা করেছিল দুজনে।

একটা একটা করে ছবি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল আবার। কত ছবি। মুখেভাত। প্রথম জন্মদিন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে ছবি। তেল চপচপে মাথায় তোলা ছবি একটার পর একটা ছবি দেখে যেতে লাগল জিনিয়া। প্রতিটা ছবি তার মাথায় গেঁথে গেছে এ কদিনে। তবু বারবার দেখতে ভালো লাগে। আবার দেখতে ভালো লাগে। ভালো লাগাও ঠিক না, এ যেন সময় কাটানোর নতুন কোনও উপায়। আজকাল তো সময় কাটতেই চায় না। সবসময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সৌপ্তিকের কথাই মনে পড়ে। এরকম সময় ও থাকলে কী হত, কী বলত? বিকেল হলে কীভাবে বলত, “উফ, কতদিন রোল খাই না। চল চল, ডায়েটিং গুলি মার।”

অথচ দেখা যাবে আগের দিনই রোল খেয়েছে। পুরো পাগল ছিল ছেলেটা।

রোহিণী চা নিয়ে ঢুকলেন। জিনিয়া বলল, “দার্জিলিংয়ের ছবিগুলো দেখছি না।”

রোহিণী খাটের ওপর চা রেখে বসলেন, বললেন, “ও হ্যাঁ। সেগুলোও আছে তো। ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি।”

জিনিয়ার কী মনে হতে বলল, “থাক কাকিমা। আমি এরকম আসি, তোমার খারাপ লাগে, না?”

রোহিণী বললেন, "নাহ। ভালো লাগে। সতুকে এত ভালোবাসো তুমি, ভাবলে তোমার জন্যও কষ্ট হয়।"

জিনিয়া বলল, "চেষ্টা করছি, একদিন হয়তো আসা বন্ধ হয়ে যাবে।"

রোহিণী জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "নিজের খেয়াল রেখো। ভালো করে খাওয়াদাওয়া কোরো। আমি ওর মা হয়েও বলছি, এত বেশি করে ওর মধ্যে জড়িয়ে পোড়ো না, কষ্ট ছাড়া কিছুই পাবে না আর।"

জিনিয়া মাথা নাড়ল, "জানি।"

রোহিণী বললেন, "তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। আজ সমু আসছে বিকেলে। ট্রেনে আছে এখন।"

জিনিয়া বলল, "ও।"

রোহিণী বললেন, "ছুটি পেল কোনওমতে। খুব জোর করছে আমাদের দেরাদুন নিয়ে যাবে বলে। বড়ো ছেলের দায়িত্ব পালন করতে চাইছে আর কি। ওর বাবা শুনবে না, জানি। দেখি। ছেলে জোরাজুরি করে যদি। আমার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠছে এ বাড়ি।"

জিনিয়া বলল, “চলে যাবে তোমরা? এ বাড়ি কী হবে?”

রোহিণী বললেন, “বিক্রি হয়ে যাবে হয়তো।”

জিনিয়া দিশেহারার মতো বসে রইল।

৩

হাওড়ায় নেমে সৌম্য দরদাম না করেই ট্যাক্সি নিল। গরম লাগছে। প্রি-পেড ট্যাক্সি না নিলে অনেকগুলো টাকা নিয়ে নেয়, ট্রেন থেকে নেমে আর লাইনে ইচ্ছা করছিল না।

শহরে পৌঁছে বরাবরই ভালো লাগে। হাওড়া ব্রিজ, গঙ্গা অনেক কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। এবার দিচ্ছিল না।

চুপ করে বসে থাকল সে।

আদিদেব অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাক্সি থামতে এগিয়ে গেলেন। সৌম্য বলল, “মা কোথায়?”

আদিদেব বললেন, “জিনিয়া এসেছে। ওর সঙ্গে কথা বলছে।”

সৌম্য বলল, “কখন এসেছে?”

আদিদেব বললেন, “সকালে।”

সৌম্য নাক কুঁচকাল, “এখনও যায়নি? কী সমস্যা ওর?”

আদিদেব সৌম্যর কাঁধে হাত রাখলেন, “ওকে কিছু বলিস না। মেন্টাল শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।”

সৌম্য বলল, “সে ঠিক আছে, কিন্তু মেন্টাল শক থেকে মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে।”

আদিদেব বললেন, “তোকে কিছু বলতে হবে না। তুই চেঞ্জ কর।”

সৌম্য ব্যাগটা বারান্দায় নামিয়ে সৌপ্তিকের ঘরে উঁকি মারল। রোহিণী বললেন, “এলি?”

সৌম্য বলল, “হ্যাঁ।”

রোহিণী বললেন, “তুই ফ্রেশ হ, আমি কিছু বানাচ্ছি।”

সৌম্য চলে যাচ্ছিল, জিনিয়া ডাকল, “শুনুন।”

সৌম্য অবাক হল। জিনিয়ার সঙ্গে তার আগে কোনও দিন কথা হয়নি। ডাক শুনে সে দাঁড়াল, “হ্যাঁ।”

জিনিয়া বলল, “বাড়িটা প্লিজ বিক্রি করবেন না, সৌপ্তিকের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।”

রোহিণী অপ্রস্তুত হলেন। সৌম্যর মাথা গরম হয়ে গেল হঠাৎ করে। সে কোনও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।

মার ওপর রাগও হচ্ছিল। মার কাজই হল উটকো ঝামেলাগুলো প্রশ্রয় দেওয়া। ফোনে জিনিয়ার কাজকর্ম শুনেই বুঝেছিল সতু চলে যাওয়ার পর মেয়েটা সাইকো হয়ে গেছে। এখন যদি তাদের পরিবারের মধ্যে ঢুকে তার কাজকর্মও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তাহলে তো মহা সমস্যা!

হাত পা ধুয়ে, চেঞ্জ করে বিছানায় শুল সে। রোহিণী চা নিয়ে এসে বললেন, “চা নে। জিনিয়া চলে গেছে।”

সৌম্য চা নিয়ে বলল, “বসো।”

রোহিণী বসলেন। সৌম্য চেঁচিয়ে ডাকল, "বাবা।"

আদিদেব এলেন। সৌম্য বললেন, "মেয়েটা কি রোজ আসছে?"

আদিদেব চেয়ার টেনে বসে বললেন, "দু-এক দিন পর পর।"

রোহিণী বললেন, "ওরকম করে বলিস না বাবা। সতুকে বড়ো ভালোবাসত মেয়েটা।"

সৌম্য বলল, "বুঝেছি মা। কিন্তু তোমাদেরও তো ভালো থাকতে দিতে হবে। সর্বক্ষণ এসে যদি এই মেয়েটা পাগলামি করে যায়, তাহলে তোমরাও ডিপ্রেশনে চলে যাবে। সেটা বুঝতে পারছ কি? এখন বলছে বাড়ি বেচবেন না। আশ্চর্য! আমি কি এখানে বাড়ি বেচতে এসেছি? আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। ওকে কে বলেছে বাড়ি বেচব?"

রোহিণী বললেন, "আমরা চলে গেলে বাড়ি রেখেই বা কী করবি?"

সৌম্য বাবার দিকে তাকাল, "তুমিও কি তাই ভাবো?"

আদিদেব বললেন, "আমি কিছু ভাবি না। ইন ফ্যাক্ট আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছাও করছে না আর। তুই কী করবি কর। ভালো লাগে না আর কিছু।"

সৌম্য বলল, “আমি কী করব মানে? আমাদের তো কথা হয়ে গেছে। পরশু আমরা চলে যাব। তোমাদের গোছগাছ হয়েছে? মা?”

রোহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “হচ্ছে।”

সৌম্য বলল, “হয়নি তার মানে। কী চাইছ তোমরা? আমি ছুটি পাই না। কোনও ভাবে ম্যানেজ করে এলাম। ঘর ভাড়া করলাম। এদিকে এখনও তোমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে যাচ্ছ। বলা যাবে, কী চাইছ?”

আদিদেব বললেন, “যাব তো তোর সঙ্গে। চিন্তা করিস না। রেস্ট নে। এই তুমি চলো। সমু রেস্ট নিক।”

আদিদেব উঠলেন। রোহিণীও। সৌম্য বলল, “কী করল মেয়েটা সারাদিন?”

রোহিণী বললেন, “তোদের অ্যালবামগুলো দেখল। সতুর জামাকাপড়গুলো ভাঁজ করে দিল।”

সৌম্য বলল, “হয়ে গেছে। এ মেয়ে গেছে।”

আদিদেব বললেন, “মেন্টাল স্ট্রাকচার সবার সমান হয় না সমু। সবাই জন্ম থেকে কঠিন মন নিয়ে জন্মায় না। এজন্য কাউকে সাইকো ভেবে নেওয়াটা ঠিক না। মেয়েটাকে সময় দিতে হবে। দেখাই যাক না। আর তুই যদি বাড়ি এখনই না বেচিস, তাহলে জিনিয়াকেই চাবি দিয়ে যাওয়া যায়। ও মাঝে মাঝে এসে দেখে রাখবে।”

সৌম্য বলল, “যা পারো কর। কী করছ, নিজেরাই বুঝতে পারছ না। ধুস।”

সৌম্য রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৪

মালতী সিরিয়াল দেখছিলেন।

অগ্নি অফিস থেকে ফিরলেন। মালতী বললেন, “কফি করে দি?”

অগ্নি বললেন, “হুঁ। তিন্নি কোথায়?”

মালতী বললেন, “ফেরেনি এখনও।”

অগ্নি বললেন, “অফিস যায়নি?”

মালতী বললেন, "না। ওই বাড়ি যাবে বলছিল।"

অগ্নি গম্ভীর মুখে বসে বললেন, "তুমি কিছু বলেছ?"

মালতী বললেন, "আমি আর কত বলব? তুমিই কথা বলো।"

অগ্নি বললেন, "আমাদের কথাতে কিছু নাও হতে পারে। পূরবীকে ডাকি। পিসির কথায় যদি কিছু হয়।"

মালতী বললেন, "বিয়ের জন্য যে গয়নাগুলো কেনা হয়েছিল, সেগুলো আলমারিতে রেখে দিয়েছে। মাঝরাতে বেনারসি, গয়না, সব পরে বসে থাকছে। আমার আর ভাল্লাগছে না।"

কেঁদে ফেললেন মালতী।

অগ্নি বললেন, "ঠিক আছে। ওকে কিছুদিন সময় দাও।"

মালতী বললেন, "আর কতদিন? আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এবার খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে।"

অগ্নি বললেন, “ঠিক আছে, তুমি কফি করো। আমি পূরবীকে ফোন করি।”

মালতী রান্নাঘরে গেলেন। অগ্নি বোনকে ফোন করতে গিয়ে থমকে গেলেন। সিরিয়াল চেঞ্জ করে খবরে দিলেন। খবরের পরিবর্তে একগাদা বিজ্ঞাপন দেখিয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক অবস্থায় অগ্নি চ্যানেল পালটাতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিট পর তামিল চ্যানেল এল। কী মনে হতে সেটাই বসে দেখতে থাকলেন। মালতী কফি নিয়ে এসে বললেন, “এসব কী দেখছ?”

অগ্নি চ্যানেল চেঞ্জ করে বললেন, “দেখছিলাম না। ভাবছিলাম।”

মালতী বললেন, “কী?”

অগ্নি বললেন, “তিন্নিকে নিয়ে কোথাও একটা থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে। কলকাতা থেকে দূরে থাকলে মনটা পালটাতে পারে।”

মালতী বললেন, “তুমি ছুটি পাবে?”

অগ্নি বললেন, “পেতে হবে। অনেক দিন তো কোথাও যাওয়াও হয় না। তিন্নি ছুটি পায় নাকি সেটাই দেখার।”

মালতী বললেন, “জানি না পাবে কি না, উলটোপালটা ছুটি নিয়ে নিয়ে তো ছুটি আর কিছু রেখেছে কি না কে জানে। দ্যাখো। আসুক।”

মালতীর কথা শেষ হতে না হতেই কলিং বেল বেজে উঠল।

মালতী দরজা খুললেন। জিনিয়া ঘরে ঢুকল।

মালতীর আজকাল জিনিয়াকে দেখলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সবসময়ের হাসিখুশি মেয়েটার মুখ থেকে কেউ যেন হাসিটা ব্লটিং পেপার দিয়ে মুছে দিয়েছে।

অগ্নি বললেন, “বোস মা। শোন না, আমরা ভাবছিলাম কোথাও একটা ঘুরে আসি কদিনের জন্য। ছুটি পাবি?”

জিনিয়া সোফায় বসে পড়ে বলল, “জানি না। কথা বলে দেখব।”

অগ্নি বললেন, “দেখ। ফোন কর।”

জিনিয়া বলল, “অফিস যাই কাল। দেখছি।”

অগ্নি বললেন, "অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয় না। দেখ যদি ছুটি ম্যানেজ করতে পারিস। আমিও আর অফিস করে করে পেরে উঠছি না বুঝলি? কোথায় যাবি? পাহাড় না জঙ্গল?"

জিনিয়া বলল, "যেখানে খুশি। তোমার যেখানে ইচ্ছা করছে চলো। আমার কোনও অসুবিধা নেই।"

অগ্নি বললেন, "আচ্ছা শোন না, তোর গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দিস কালকে মনে করে। লকারে রেখে আসতে হবে। বাড়িতে থাকলে প্রচুর রিস্ক তো, তাই না?"

জিনিয়া মাথা নাড়ল শুধু।

অগ্নি বললেন, "কোথায় গেছিলি মা?"

জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকদের বাড়ি। ওখানেই ছিলাম। ওর দাদা এসেছে।"

অগ্নি মালতীর দিকে এক পলক তাকিয়ে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেই যে ওদের নিয়ে যাবে বলছিল, সেসব কিছু?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।

অগ্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “কী-ই বা করবেন। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ওর দাদা তো ওখানে কলেজে পড়ায়, তাই না?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।”

অগ্নি বললেন, “তুই অনেকদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাস না কিন্তু মা। আজকাল আর ইচ্ছে করে না যেতে?”

জিনিয়া বলল, “যাব। আমি ঘরে যাই। তোমরা টিভি দ্যাখো।”

যন্ত্রের মতো উঠে জিনিয়া তার ঘরে চলে গেল।

মালতী কাতর গলায় অগ্নিকে বললেন, “দেখলে? কেমন হয়ে গেছে? ভালো লাগে বলো তো?”

অগ্নি টিভির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন।

কয়েক মিনিট পরে জিনিয়া হঠাৎ এসে বলল, “আচ্ছা বাবা, সৌপ্তিকদের বাড়িটা বিক্রি হবে। আমরা কিনে নিতে পারি না?”

মালতী আর অগ্নি দুজনেই চমকে জিনিয়ার দিকে তাকালেন।

৫

রাত বারোটা। জিনিয়া সব গয়না পরে আয়নার সামনে বসে আছে। তার গায়ে কোনও কাপড় নেই। সে ফোনের ক্যামেরা দিয়ে নিজের কয়েকটা ছবি তুলল।

অন্য সময় হলে ছবিগুলো সৌপ্তিককে পাঠাত। এবার সব ছবি পরপর দেখে ডিলিট করে দিল। সোয়াইপ করে করে তার আর সৌপ্তিকের ফটোগুলো এক এক করে দেখতে শুরু করল।

পাড়ার একটা বাচ্চা কুকুরকে একটা ট্রাক মেরে দিয়ে গেছে। তার মা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে।

জিনিয়া গয়নাগুলো খুলে ফেলে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখল। রাতের পোশাক পরে খাটে শুল। ব্যাংক ব্যালেন্স চেক করল নিজের। লাখ খানেকটাকা পড়ে আছে। সৌপ্তিকদের বাড়ির দাম কত হবে? ধারণা করতে পারল না। বিভিন্ন ব্যাংকের হোম লোন স্কিমগুলো পড়তে শুরু করল।

অনেকক্ষণ সেসব দেখতে দেখতে রাত দুটো বাজল।

খিদে পেল হঠাৎ করে। উঠে দরজা খুলে ডাইনিং রুমে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা পাউরুটি প্যাকেট থেকে বের করে খেল।

কী মনে হতে টিভি চালিয়ে কম ভলিউমে দেখতে শুরু করল।

কখন ঘুম এসেছে বুঝতে পারেনি, ঘুম ভাঙতে দেখল সোফাতেই শুয়ে পড়েছিল সে।

অগ্নি কাগজ পড়ছেন চেয়ারে বসে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "ডাকবে তো!"

অগ্নি বললেন, "ঠিক আছে। ডাকার কী আছে? মশা কামড়ায়নি তো?"

জিনিয়া চুল সরাতে সরাতে বলল, "না। আচ্ছা বাবা, সৌপ্তিকদের বাড়ির দাম কেমন হতে পারে? আমি যদি হোম লোন নিই?"

অগ্নি কয়েক সেকেন্ড জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাম কেমন হতে পারে, আমি তো বলতে পারব না। ওঁরা কত দামে বেচবেন, সেটা ওঁরাই জানেন।"

জিনিয়া ঠোঁট কামড়াল, "রাইট। তাহলে ওঁদেরই ফোন করি?"

অগ্নি বললেন, “সে কর। কিন্তু আমাকে একটা কথা বল মা, এ বাড়ি কি তোর ভালো লাগে না? ওদের বাড়িটা কিনতে হবে কেন?”

জিনিয়া থমকে গেল। কী বলবে বুঝতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ এ কথা, সে কথা ভেবে বলল, “সৌপ্তিকের স্মৃতি তো। বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা? ওর জন্ম, বেড়ে ওঠা, শেষ দিন যখন ঘর থেকে বেরোল, সব... সব স্মৃতি ওখানে। বুঝতে পারছ না বাবা?” জিনিয়ার গলাটা ভীষণ কাতর শোনাল।

অগ্নি কাগজটা রেখে বললেন, “বিক্রমপুরে আমাদের বাড়ি ছিল। দেশভাগের সময় তোর ঠাকুরদাকে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছিল। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, সব ওখানে। কিন্তু পেরেছিলেন কি সেটা রাখতে? সব কিছুকে তো ধরে রাখা সম্ভব না। যে ছেলেটাই আর রইল না, তার বাড়িটা কিনে কী করবি বল তো?”

জিনিয়া চোয়াল শক্ত করে বাবার কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অগ্নি জিনিয়ার যাওয়াটা দেখলেন শুধু চুপ করে। পিছু ডাকলেন না।

কিছুক্ষণ পর জিনিয়া তৈরি হয়ে গয়নার বাক্সগুলো অগ্নির সামনের টেবিলে রেখে বলল, “গয়নার বাক্সগুলো নিয়ে নিয়ো বাবা। আমি বেরোচ্ছি।”

অগ্নি অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকদের বাড়ি।"

মালতী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, "তুই আজকেও অফিস যাবি না? এরকম করে চাকরিটা রাখতে পারবি?"

জিনিয়া বলল, "যাব, অফিস যাব। ওর দাদার সঙ্গে কথা বলে ওখান থেকে অফিস রওনা দেব।"

মালতী বললেন, "কী কথা বলবি? বাড়ি কিনবি ওদের? তুই এসব কী শুরু করলি বল তো?"

জিনিয়া বলল, "কিছু শুরু করিনি। যদি কেনা সম্ভব হয়, তাহলে ওদের বাড়ি আমিই কিনে নেব।"

মালতী বললেন, "খেয়ে যা কিছু। দাঁড়া, একটু বস, ডালিয়া করেছি। এক চামচ খেয়ে যা। খালি পেটে যাস না।"

জিনিয়া সোফায় বসল। উত্তেজনায় তার পা কাঁপছিল।

অগ্নি এবার সত্যিই মেয়েকে দেখে চিন্তিত হলেন। অসহায় বোধ করছিলেন বড্ড। সব কিছু কি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে এবারে?

৬

ক্লাসরুমের বাইরের গাছে একটা কাঠঠোকরা বসে আছে। উদ্দালক মন দিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল কাঠঠোকরা প্রকৃতিগতভাবে যতটাই কাঠখোট্টা হোক, দেখতে বেশ সুন্দর। চঞ্চুর গঠনটাও বেশ মজার। এটা যদি হেডস্যারের টাকে ঠুকরাতে শুরু করত, তাহলে টাকটার দশা খুব একটা ভালো হত না।

উদ্দালক হেডস্যারের টাকটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিল।

সেভেন বি ভীষণ ঝামেলার ক্লাস। কোনও ছেলে কারও পিঠে চিমটি কেটে দিচ্ছে, কেউ বা কারও পিছনে কম্পাস গুঁজে দিচ্ছে, এই ক্লাস সামলানো সবার পক্ষে সম্ভব না। এদিকে আজকাল সরকারি নির্দেশ আছে, শিশুমনে কোনওরকম আঘাত দেওয়া যাবে না। গায়ে হাত তোলার তো প্রশ্নই নেই।

উদ্দালক মারতে চায়ও না। এদের মেরে লাভ নেই। এরা কী হবে এখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছে। লাস্ট বেঞ্চের পল্টু যেমন এখন থেকেই বাবার দোকানে বসে। তার

পাড়াতেই থাকে। এটা সেটা লাগলে সে-ই দিয়ে যায়। শান্ত ছেলে এমনিতে। ক্লাসে এলে বেয়াদপি শুরু করে।

মাথাটাও একটু ডাল। পল্টু কী করে সেভেনে উঠল, লাখ টাকার প্রশ্ন। পল্টুর বাবা একবার এসে বললেন পড়ানোর জন্য। উদ্দালক না করেনি।

পল্টু মাঝে মাঝে বইখাতা নিয়ে আসে। কিছুটা পড়ার পরে পল্টু অদ্ভুত সব প্রশ্ন শুরু করে। তারা যদি মুরগির ব্যবসা করতে তাহলে কি মুদির দোকানের থেকে বেশি লাভ হত টাইপ প্রশ্ন। সেই সময় উদ্দালকের মুরগির মাংস খেতে ইচ্ছা করে। পল্টু টাকা নিয়ে মুরগির মাংস আনতে ছোটে। দুজনে মিলে রান্না করে। মাস্টার ছাত্র মিলে এক কিলো মাংস সাবাড় করে। পল্টু ভালো খেতে পারে। একাই বেশিরভাগটা টানে। তবে উদ্দালকের রান্না করতে ভালো লাগে। বিভিন্ন স্টাইলে মাংস রাঁধে। পল্টু সেগুলোর স্বাদ পরীক্ষক। খেয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করে।

ক্লাসে গোলমাল ভালোই হচ্ছিল। উদ্দালকের সেদিকে মন ছিল না। হেডস্যার তপনবাবু স্কুল ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ক্লাসের দরজায় এসে জোরে চিৎকার করলেন, “সাইলেন্ট।”

তপনবাবুর সাইলেন্ট শুনে উদ্দালকও নড়ে বসল। স্কুলের মতো সেও চেয়ার থেকে উঠে বলে বসল, “ইয়েস স্যার।”

তপনবাবু ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কি ক্লাস হচ্ছে না চিড়িয়াখানা? হোয়াট ইজ দিস? একটা শব্দ যদি পাই তাহলে গোটা ক্লাসকে টিসি দিয়ে দেব। উদ্দালক, ক্লাসের পরে আমার ঘরে এসো।"

উদ্দালক ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে স্যার।"

তপনবাবু চলে যেতেই ক্লাসের ছেলেগুলো আবার লাফঝাঁপ দিতে শুরু করল।

উদ্দালক বলল, "টিসি দিলে বুঝবি তোরা।"

শম্ভু ক্লাস পালিয়ে বাথরুমে বিড়ি খায়। তবে উদ্দালকের ক্লাস কখনও পালায় না। সে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, টিসি কী?"

উদ্দালক বলল, "খুব কঠিন একটা ব্যাপার। আর স্কুলে আসতে পারবি না।"

শম্ভু বলল, "সে তো ভালোই স্যার। স্কুলে আসতে ভালো লাগে না। আপনার ভালো লাগে?"

উদ্দালক চোখ নাক মুখ কুঁচকে বলল, "আমারও লাগে না। জঘন্য জায়গা। তার ওপর তোদের মুখগুলো দেখতে হবে ভাবলে আরও জঘন্য লাগে।"

ক্লাসে হাসির রোল উঠল।

শম্ভু বলল, "স্যার আপনি বিয়ে করবেন না?"

উদ্দালক চোখ পাকিয়ে তাকাল।

ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল।

উদ্দালক বেরিয়ে হেডস্যারের ঘরে গেল। তপনবাবু গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "এসব কী উদ্দালক? ক্লাস কন্ট্রোল করতে পারো না? রোজ রোজ সেভেন বি-তে ঝামেলা হয়?"

উদ্দালক দেখেছে এই সময় কথা বললেই ঝামেলা। সে হাসি হাসি মুখে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

তপনবাবু বললেন, "এরকম হলে কিন্তু ভারী বিপদ উদ্দালক। এতগুলো বছর চাকরি করতে হবে তোমায়। এখন থেকেই যদি এরকম হও..."

উদ্দালক বলল, "স্যার, আমার মনে হয় না খুব বেশি বছর চাকরি করতে পারব।"

তপনবাবু বললেন, “কেন?”

উদ্দালক বলল, “ভোটের ডিউটিগুলো পড়লেই আমার মনে হয় এই বোধহয় শেষ। গতবার আমার বুথে বোম ফেলল। আপনার মনে হয় আমরা এত দিন বাঁচব?”

তপনবাবু বললেন, “তাহলে? তুমি ভোট করতে পারছ আর একটা সেভেন বি সামলাতে পারছ না?”

উদ্দালক বলল, “স্যার এই নেতাগুলো সেভেন বি-র ছেলেগুলোর থেকে ভালো। আমি শুধু ভাবি এই ছেলেগুলো যখন বড়ো হয়ে নেতা হবে তখন কী হবে।”

তপনবাবু মাথা চুলকালেন। তিনিও বোধ হয় দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভেবে ফেলেছিলেন। পরক্ষণে সামলে বললেন, “আমি ওসব বুঝি না উদ্দালক। তোমাকে ক্লাস সামলাতে হবে। যেভাবেই হোক। বি এ ম্যান। ওইটুকু বাচ্চাদের তোমার পারসোনালিটি দেখাও। এখন একা আছ, এখনই পারসোনালিটি নেই। বিয়ে করলে কী হবে? তখন তো তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।”

উদ্দালক বলল, “চেষ্টা করছি স্যার।”

তপনবাবু বললেন, “ঠিক আছে যাও। যেটা বললাম মনে রেখো। বি এ ম্যান। বুঝলে? বি এ ম্যান। শো ইওর ম্যানফোর্স।”

বলেই তপনবাবু জিভ কাটলেন।

৭

জিনিয়ার প্রস্তাব শুনে আদিদেব আর রোহিণী দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আদিদেব বললেন, “তুমি ভেবে বলছ, যা বলছ?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ। আমি ভেবে নিয়েছি। তোমরা কি বাড়ি বেচবে?”

উৎসুক চোখে তাকাল জিনিয়া।

আদিদেব বললেন, “দ্যাখো মা, এ নিয়ে তো আমরা কিছুই ভাবিনি এখনও। পুরোটাই সৌম্য ঠিক করবে। ওর সঙ্গে কথা বলে তোমাকে জানাব নাহয়?”

জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। কোথায় উনি?”

আদিদেব ইতস্তত করলেন। জিনিয়ার প্রস্তাব শুনে সৌম্য জিনিয়াকে অপমান করে বসতে পারে। বললেন, "ও বেরিয়েছে। ফিরলে কথা বলে তোমাকে ফোন করি?"

জিনিয়া বলল, "অসুবিধা নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারি। আচ্ছা উনি ফোন নিয়ে বেরোননি? দ্যাখো না একটু ফোন করে যদি পাওয়া যায়।"

রোহিণী জিনিয়ার হাত ধরে বললেন, "মা, তোমাকে একটা কথা বলি?"

জিনিয়া বলল, "বলো।"

রোহিণী বললেন, "কথাটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, তবু বলি। তুমি সতুকে ভুলে যাও।"

জিনিয়া রোহিণীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "তুমি চাইছ না আমি এ বাড়িটা কিনি?"

রোহিণী বললেন, "আমি চাইছি তুমি এবার এগিয়ে যাও। থেকো না আর এই কাল্পনিক পৃথিবীটাতে। তুমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছ। দ্যাখো, আমি তো মা, আমি বুঝতে পারছি সতু নেই বলে তোমার ঠিক কতটা কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বোধহয় একটা সময় আসে, যখন আমাদের পুরোনো সব কিছুকে ভুলে এগিয়ে যেতে হয়। তুমি ভুলে যাও সতুকে। আমি বলছি তোমায়।"

জিনিয়া মাথা নিচু করে বলল, "সবাই আমাকে শুধু একটা কথাই সর্বক্ষণ বলে যাচ্ছে। ভুলে যাও, ভুলে যাও। আমি কেন ভুলে যাব বলো তো? কেন ভুলে যাব? আমার কোনও অনুভূতি থাকতে পারে না? আমি যদি চাই ওর স্মৃতিটাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে, কেন আমার সেই অধিকার থাকবে না? বিয়েবাড়ি যাবে বলে বেরোল। হঠাৎ করে শুনি ভিড় ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। ও আর নেই। আমি সেদিন থেকে প্রতিটা দিন মরছি একটু একটু করে। আমি যদি চাই কোনওভাবে ওর সঙ্গেই থেকে যেতে, কেন আমাকে থাকতে দেওয়া হবে না? কেন আমাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সবাই? কী পাপ করেছি আমি?"

কান্নায় ভেঙে পড়ল জিনিয়া। রোহিণী জিনিয়ার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জড়িয়ে ধরলেন জিনিয়াকে।

সৌম্য বাজার গেছিল। অনেক দিন পরে চেনা বাজার ঘুরতে ভালো লাগছিল। সবজি কিনল বেশ খানিকটা। মাংস কিনতে গিয়ে থমকে গেল। সতু মাংস খেতে ভালোবাসত। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ বাজার নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বাড়ি ঢুকে দেখল জিনিয়া কাঁদছে।

সে আদিদেবের দিকে তাকাল, "কী হচ্ছে এখানে বাবা?"

হঠাৎ করে সৌম্য আসায় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে আদিদেব বললেন, "ও আমাদের বাড়িটা কিনতে চায়। সতুর স্মৃতি..."

কথা বলা শেষ করে উঠে পারলেন না আদিদেব, সৌম্য চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়ার্কি হচ্ছে এখানে? এ বাড়ি কি আমার বাড়িও না? কী শুরু হয়েছে? যে মারা গেছে সে কি আমারও ভাই না? ন্যাকামি মারার একটা সীমা থাকা দরকার!"

সৌম্যর চিৎকারে জিনিয়া স্থবির হয়ে গেল।

রোহিণী তাড়াতাড়ি সৌম্যর হাত ধরে বললেন, "তুই ঘরে চ। ঘরে চ। এখন রাগারাগি করিস না বাবা।"

সৌম্য ভীষণ রেগে গেছিল। সে বলল, "কেন ঘরে যাব? কেন বেচব বাড়ি? আপনি আমাকে বলুন তো, আপনার বাড়ি কেউ কিনতে চাইলে আপনি বেচে দেবেন?"

জিনিয়া মাথা নিচু করে কেঁদে চলল। আদিদেব বললেন, "সমু ঘরে যা প্লিজ। মাথা ঠান্ডা কর। যা। পাড়ার লোক চলে আসবে এখানে চ্যাঁচামেচি হলে। সিন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। তুই ঘরে গিয়ে মাথা ঠান্ডা কর।"

সৌম্য ছটফট করতে করতে নিজের ঘরে গেল।

রোহিণী বললেন, "তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না মা, ও খুব সেন্টিমেন্টাল। বাড়ি বেচতে চাইছে না আসলে।"

জিনিয়া ভাঙা গলায় বলল, "তাহলে তোমরা যে চলে যাচ্ছ?"

রোহিণী বললেন, "তুমি সতুর অ্যালবাম, জামাকাপড় নিয়ে যাও। আমরা তো কাল চলে যাব, তুমি আজ নিয়ে যাও সব। তাহলে হবে না?"

জিনিয়া শূন্য দৃষ্টিতে একবার রোহিণী, আর-একবার আদিদেবের দিকে তাকাল।

৮

রান্নাঘরে বাজার রেখে সৌম্য ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে মোবাইল খুটখুট করছিল।

আদিদেব ঢুকলেন। বললেন, "রাগ কমেছে? তোর রাগ তো হাউইয়ের মতো, এই উঠে গেল, তারপর নেমে যায়। কমেছে রাগ?"

সৌম্য গুম হয়ে বসে থাকল।

আদিদেব বললেন, “কাজটা কি ভালো হল সমু? মেয়েটার সঙ্গে সতুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। একগাদা স্বপ্ন দেখেছিল। সব শেষ হয়ে যাবার পর মেয়েটা যদি একটু পাগলামিও করে, সেটাকে এভাবে চ্যাঁচামেচি করে কমানো সম্ভব?”

সৌম্য বলল, “তো কী করব, তুমি বলো। ওকে বাড়ি বিক্রি করব? এ বাড়িতে আমিও তো বড়ো হয়েছি। সতুর সঙ্গে আমার স্মৃতি নেই? হুট করে এসে যদি বলে বাড়ি কিনতে চায়, আর তাতে যদি আমার মাথা গরম হয়ে যায়, সেটা কি খুব অস্বাভাবিক কিছু?”

আদিদেব সৌম্যর কাঁধে হাত রাখলেন, “একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু আমাদের ছেলে মারা গেছে। তোর ভাই মারা গেছে। আমরা ওকে ভুলতে শহর ছেড়েই চলে যাচ্ছি। মেয়েটাকে তো এখানেই থাকতে হবে। ওর কথা ভাবব না কেউ?”

সৌম্য চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক আছে। আমি সরি বলছি।”

আদিদেব হাসলেন, “গুড। বল। তোর থেকে আমরা সেটাই এক্সপেক্ট করি।”

সৌম্য উঠে বারান্দায় গেল। রোহিণী জিনিয়াকে ধরে বসেছিলেন। সৌম্য চেয়ারে বসে বলল, “আই অ্যাম সরি। আমার ওভাবে বলাটা উচিত হয়নি।”

জিনিয়া কিছু বলল না।

সৌম্য মার দিকে তাকাল। রোহিণী জিনিয়াকে বললেন, "সমু সরি বলছে মা।"

জিনিয়া চোখের জল মুছে বলল, "ঠিক আছে।"

আদিদেব এসে বসলেন। বললেন, "সৌম্য তো ঠিক এরকম না। ওর মাথা চট করে গরম হয়ে যায়। রাগ কমেও যায়। সতুও একইরকম ছিল তুমি জানো। কিছু মনে কোরো না।"

জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে। আমিও দুঃখিত। আমি যে কী করছি, কী বলছি, আমারও মাথায় থাকছে না। আসলে কাল কথায় কথায় তোমরা বললে শহর ছেড়ে তোমরা চলে গেলে বাড়ি বিক্রি করে দেবে, সেই থেকে আমার মাথা কাজ করছে না। আমার শুধু মনে হচ্ছে তাহলে কী হবে? সৌপ্তিকের সবটাই তো এ বাড়িতে। সেটাই যদি না থাকে তাহলে তো সবই চলে গেল।"

সৌম্য বলল, "বাড়ি বিক্রির কথা উঠতে পারে যেহেতু বাবা মা থাকবে না। কিন্তু আমিও এখন বাড়ি বিক্রির পক্ষপাতী নই।"

জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে, আপনারা তো চলে যাচ্ছেন, আমি তবে অ্যালবামগুলো নিই? যেখানে ওর ফটো আছে সে ছবিগুলো?"

সৌম্য বলল, "কাল বাবা বলছিল আমরা যখন থাকব না, আপনার কাছে চাবি দিয়ে যাবে। তাই হোক নাহয়। আপনি চাবি রেখে দিন। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।"

জিনিয়া চমকে আদিদেবের দিকে তাকাল। আদিদেব আর রোহিণী অবাক হলেন সৌম্যর হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে।

জিনিয়া বলল, "আমার তাতে কোনও অসুবিধা নেই। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, যদি কোনওভাবে বাড়ি বিক্রি করার কথা আপনাদের মাথায় আসে, তাহলে আমার সঙ্গেই কথা বলবেন প্লিজ। আমি যদি কোনওভাবে না পারি, তখন দেখা যাবে। সৌপ্তিকের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে ভাবতেই আমি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।"

আদিদেব বললেন, "আমাদের বাড়ির দুটো চাবি আছে। একটা রোহিণী তোমাকে এখনই দিয়ে দিচ্ছে। রেখে দাও। ঠিক আছে?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল। বলল, "আমি অফিস যাব। তাহলে আর সৌপ্তিকের কোনও জিনিস এখন আর নিচ্ছি না। মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে যাব।"

রোহিণী কাঁদছিলেন। জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ভালো থাকো মা। সতুর দুর্ভাগ্য এত ভালো বউ নিয়ে সংসার করতে পারল না। আমাদের দুর্ভাগ্য তোমার

সঙ্গে থাকতে পারলাম না। যে যা কপাল করে আসে। কিছু তো করার নেই। জীবন এরকমই হয়। দাঁড়াও তোমাকে ডুপ্লিকেট চাবিটা এনে দি।”

রোহিণী উঠলেন।

সৌম্য বলল, “আমার বাবা মাও আমাকে ভুল বোঝে। দূরে দূরে ছিলাম তো বরাবর। সতু দেখে রাখত ওদের। আমি বাবা মাকে আমার কাছে নিতে এসেছি। বাড়ি বেচব এ কথা কোনও দিন ভাবি নি। ভাবতে চাইও না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।”

জিনিয়া চুপ করে বসে রইল। কিছু বলতে পারল না।

৯

সন্ধেবেলা। পল্টু পড়তে এসেছে।

উদ্দালক মুড়ি খাচ্ছিল।

পল্টু দেখে বলল, “স্যার মুড়ি খাচ্ছেন স্যার? আমায় বলতেন, আমি চাউ নিয়ে আসতাম।”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। বেশি কথা বলিস না। পড়তে বস। অঙ্কগুলো পারলি কিছু?”

পল্টু বলল, “খুব কঠিন স্যার। পারা যাচ্ছে না।”

উদ্দালক বলল, “কঠিন? দেখি কী অঙ্ক আছে।”

পল্টু বলল, “স্যার, পেম কী?”

উদ্দালক নাক কুঁচকাল, “কী?”

পল্টু বলল, “পেম স্যার।”

উদ্দালক কয়েক সেকেন্ড বোঝার চেষ্টা করে বুঝল পল্টু “প্রেম” জিজ্ঞেস করছে। মাথা চুলকে বলল, “সে খুব কঠিন ব্যাপার। অঙ্কের থেকেও কঠিন। তোর বুঝে কাজ নেই।”

পল্টু বলল, “স্যার বিনোদ পেম করছে জানেন। গালস স্কুলে একটা মেয়ে পড়ে। রোজ যায়।”

উদ্দালক বলল “তো? তোর ইচ্ছা করছে? বাবাকে বলব?”

পল্টু জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “না স্যার। আমার ইচ্ছা করছে না। আপনি অঙ্ক বোঝান।”

উদ্দালক বলল, “তুই এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় তো। জলদি যা। দাঁড়াবি না দোকানে। নিয়েই চলে আসবি।”

পল্টু ঘাড় নেড়ে দৌড় লাগাল। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়েছিল। বাটিটা সিংকে রেখে এসে সে দেখল ফোন বাজছে। মা ফোন করছে, ধরল, “বলো।”

“কী করছিস? খেলি কিছু?”

“হ্যাঁ। এই তো মুড়ি খেলাম।”

“হুঁ। স্কুল ঠিক চলছে?”

“হ্যাঁ। ওই যেমন চলে।”

“শোন, এই শনিবার কলকাতা যাব। ছুটি নে।”

উদ্দালক বিরক্ত হল, “আবার মেয়ে দেখা? ছাড়ো না মা।”

মা বলল, “আমি ছাড়ব না। তোকে বিয়ে দিয়েই আমি মরব এটা মনে রাখিস।”

“এটা কী ধরনের কথা বললে? এর মধ্যে মরার কথা এল কোত্থেকে বলো তো?”

“তুই যাবি কি না বল।”

“ঠিক আছে যাব। রাখো এবার। পল্টু পড়তে এসেছে। পড়াই।”

“লক্ষ্মী ছেলে আমার। খেয়ে নিস রাতে।”

“খাব। রাখো এবার।”

মা ফোন রাখল।

পল্টু সিগারেট নিয়ে এসেছে। খাটে বসে জানলা খুলে দিয়ে উদ্দালক সিগারেট ধরাল। বলল, “অঙ্কগুলো কিছু কঠিন না। তুই আমার সামনে বসে কর দেখি। আগে প্রশ্নটা খাতায় টোক। আমাকে বোঝা কী বলতে চেয়েছে।”

কয়েকটা অঙ্ক করা হল। পল্টুকে বোঝাতে উদ্দালকের হাল খারাপ হয়ে গেল। শেষে একটা অঙ্কে ডিমের ব্যবসায়ীর উল্লেখ থাকায় উদ্দালক বলল, "যা বাবা, আজ অনেক পড়েছিস, ডিম নিয়ে আয়। আজ ডিমের কষা করি।"

পল্টু খুশি হয়ে বলল, "স্যার আলুও আনি। বড়ো বড়ো করে কাটা আলু আর দুটো করে ডিম। হাঁসের ডিম আনব?"

উদ্দালক বলল, "মুরগিই আন। হাঁস পোষায় না।"

পল্টু ডিম নিয়ে এল। মাস্টার ছাত্রতে মিলে রান্না শুরু হল। পল্টু পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বলল, "স্যার, পেম মানেই টাকা খরচ মনে হয়। বিনোদ ওর বাপের মানিব্যাগ থেকে টাকা ঝেড়েছিল বলে খুব ক্যালানি খেল।"

উদ্দালক ডিম সেদ্ধ দিয়েছিল। চারটে ডিম সেদ্ধ হয়েছে। একটা ডিম ছুরি দিয়ে কেটে গোলমরিচ ছড়িয়ে পল্টুকে বলল, "এ নে, হাফ খা।"

পল্টু হাফ ডিম মুখে চালান করে দিল।

উদ্দালক ডিম খেতে খেতে বলল, "বিনোদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে ওর বাবা। প্রেমের নেশা ঘুচে যাবে।"

পল্টু কৌতূহলী হল, "কেন স্যার? বিয়ে করলে পেম চলে যায়?"

উদ্দালক বলল, "ওরকমই কিছু ব্যাপার।"

পল্টু বলল, "আপনি পেম করেননি?"

উদ্দালক বলল, "না।"

পল্টুর এবার আরও কৌতূহল বাড়ল। বলল, "কেন স্যার?"

উদ্দালক বলল, "সময় পাইনি।"

পল্টু বলল, "তা হবে স্যার। পেমে অনেক সময় লাগে। বিনোদ তো সারাক্ষণ ফোনে কথা বলে যায়। খেলতে ডাকি, আসে না। আপনি তো সারাদিন পড়েছেন বলুন?"

উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "হ্যাঁ, অনেক পড়ে এখন তোদের পড়াচ্ছি।"

পল্টু বকে যেতে লাগল। উদ্দালক আবার সিগারেট ধরাল।

লাল লাল ডিমের ঝাল ঝোল খেতে দারুণ হল। পল্টু দাঁত বের করে বলল, "যাই স্যার। আবার বাড়িতে গিয়ে খেতে হবে। বাবা বলেছে কাল আপনার জন্য ভেটকি মাছ পাঠিয়ে দেবে। ওটাও ঝাল করে রান্না করা যাবে।"

উদ্দালক বলল, "সাবধানে যা।"

পল্টু চলে গেলে উদ্দালক দরজা বন্ধ করে ডায়েরি নিয়ে বসল।

একটা লেখা মাথায় আসছে। দেখা যাক, কতটা পাতায় নামাতে পারে...

১০

টিচার্স রুমে তারাপদবাবু আর সমরেশবাবুর প্রায়ই ঝামেলা লাগে। দুজনে দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থক। উদ্দালক স্কুলে পৌঁছে দেখল শুরু হয়ে গেছে ঝামেলা।

তার ফার্স্ট পিরিয়ড অফ আছে। সে চেয়ারে বসে মন দিয়ে দুজনের বক্তব্য শুনতে লাগল। পাশ থেকে সুদেববাবু ফিসফিস করে বললেন, "আজ আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন তোমার, মনে আছে তো?"

উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অবিবাহিত হবার এই এক সমস্যা। সবাই বিভিন্ন জায়গার মেয়েদের সঙ্গে তাকে জুড়ে ফেলবে। সুদেববাবুর শালি আছে। বেশ কয়েকবার কথা

তুলেছেন। উপরোধে শেষে একবার “হ্যাঁ” বলে ফেলেছে। সেদিন যে আজকেই তা মাথায় ছিল না। বলল, “হ্যাঁ, মনে আছে।”

সুদেববাবু বললেন, “চিংড়ি চলে তো?”

উদ্দালক বলল, “চলে।”

সুদেব বললেন, “মাটন? রেজালাটা আমার মিসেস দারুণ করে বুঝলে?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ।”

সুদেব বললেন, “কাঁচা আমের চাটনি?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ। আচ্ছা আমাকে হেডস্যারের ঘরে যেতে হবে। আমি ঘুরে আসি।”

সুদেববাবু বললেন, “কেন বলো তো?”

উদ্দালক বলল, “মা এক মেয়ে দেখেছে। শনিবার আশীর্বাদ। ছুটি নিতে হবে।”

সুদেববাবুর মুখটা এতক্ষণ কর্পোরেশনের ভেপার লাইটের মতো জ্বলছিল। উদ্দালকের কথায় সে মুখে লোডশেডিং চলে এল, "মানে? তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?"

উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। ঠিক হয়ে গেছে তো। ওহ আপনাকে বলা হয়নি তার মানে।"

সুদেববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আজকের রাতের প্রোগ্রামটা ক্যানসেল হতে পারে বুঝলে? গিন্নি বলছিল বটে কী একটা সমস্যা আছে।"

উদ্দালক গম্ভীর মুখে বসে রইল। মানুষের মতো হাড়হারামি জিনিস খুব কম আছে। যতক্ষণ ধান্দা আছে, ততক্ষণ জ্বালিয়ে খাবে। যেই দেখবে তাকে দিয়ে ধান্দা মেটার সম্ভাবনা নেই, তখন মুখ ঘুরিয়ে নেবে। সুদেববাবু কিছুক্ষণ পরেই উঠে গিয়ে কোত্থেকে ঘুরে এসে বললেন, "না হে, আজ প্রোগ্রামটা হচ্ছে না। আমার গিন্নির শরীরটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে।"

তারাবাবু আর সমরেশবাবুর কাজিয়াটা বেড়ে উঠেছে। উদ্দালক এবার গলা নামিয়ে বোমাটা ছাড়ল, "আসলে আশীর্বাদ না, এমনি দেখতে যেতাম। ঠিক আছে, প্রোগ্রাম যখন ক্যানসেল করেছেন, তখন থাক।"

সুদেববাবুর মুখের ঔজ্জ্বল্য ফিরে এল। বললেন, "ওহ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আসলে বুঝলে না, গিন্নির শরীর খারাপ থাকলেও শালিই সব করবে। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। আর তোমাকে একটা কথা বলি, বাইরে এসো।"

সুদেববাবু উঠলেন। অগত্যা উদ্দালককেও উঠতে হল। টিচার্স রুমের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে সুদেববাবু গলা নামিয়ে বললেন, "কলকাতার মেয়েদের বিয়ে করবে না কখনও। ওখানে তো ফ্রি সেক্স চলে। বিয়ের আগে সবার হয়ে যায়।"

উদ্দালক ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, "কী হয়ে যায়?"

সুদেববাবু বললেন, "আরে জীবনবিজ্ঞানে পড়ায় না, নিষেক; নিষেক হয়ে যায়। সব পর্দাছেঁড়া মাল। কলকাতার মেয়ে বিয়ে কোরো না হে। আমার কথা শোনো, আমার শালিকে দেখো আজ, যেমন নম্র, তেমন ভদ্র। ছেলেদের দিকে চোখে চোখ রেখে কথা পর্যন্ত বলতে গিয়ে গলা কেঁপে-টেপে একশা হয়ে যায়। তোমার বাবা মার নাম্বারটাও দিয়ো আমাকে। দরকার হলে আমি কথা বলে নেব।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে, আপনি তো আজকের প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করেই দিয়েছেন, শনিবার আমি কলকাতা থেকে ফিরি, তারপর নাহয় একদিন নেমন্তন্ন করবেন? আজ ছেড়ে দিন।"

সুদেববাবু হতাশ মুখে বললেন, “আর কলকাতার মেয়ে যদি তোমার পছন্দ হয়ে যায়, তখন কী হবে?”

উদ্দালক বলল, “পছন্দ হবে না। আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে থাকবে।”

সুদেববাবু খুশি হয়ে বললেন, “মনে থাকবে?”

উদ্দালক বলল, “নিশ্চয়ই মনে থাকবে। আপনি এত রিসার্চ করেছেন কলকাতার মেয়েদের ব্যাপারে, আমার মনে থাকবে না?”

সুদেববাবু বললেন, “বাহ। এসো, আমি আঙুর এনেছি, আঙুর খাও।”

ঘণ্টা পড়ে গেল প্রার্থনার। উদ্দালক বলল, “টিফিনে খাই? আপাতত দেশ বন্দনায় মন দি?”

সুদেববাবু দাঁত বের করে বলল, “আমার শালির নামও বন্দনা। সুন্দর নাম না?”

উদ্দালক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলল।

১১

অফিসে দেরি করে ঢুকল জিনিয়া। বস সুপ্রতিম রায় তার ডেস্কে এসে বললেন, “সব ঠিক আছে জিনিয়া?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে।”

সুপ্রতিম বললেন, “শরীর?”

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রতিম বললেন, “যাওয়ার সময় অফিস ভেহিকেলে যেয়ো। একা যেতে হবে না। আমি বলে রাখব।”

জিনিয়া বলল, “থ্যাংকিউ স্যার।”

সুপ্রতিম বললেন, “টেক কেয়ার।”

সুপ্রতিম যেতে সুলগ্না তার কাছে এসে বলল, “তোকে নিয়ে খুব ভাবছেন স্যার আজকাল। তোর কথাই জিজ্ঞেস করছিলেন।”

জিনিয়া কম্পিউটার অন করে বলল, “ও।”

সুলগ্না বলল, "কী হল? আজকে আর গালাগালি দিলি না।"

জিনিয়া বলল, "ভালো লাগছে না।"

সুলগ্না তার পাশে বসল। জিনিয়ার থমথমে মুখে দেখে বলল, "কাল আসিসনি কেন? কোথাও গেছিলি?"

জিনিয়া মিথ্যে বলল, "বাড়িতেই ছিলাম, সারাদিন শুয়ে ছিলাম।"

সুলগ্না বলল, "শোন না, আজ অফিসের পরে রক্ষিতের বাড়িতে পার্টি আছে। চ, ভালো লাগবে।"

জিনিয়া বলল, "যাব না। কাজ আছে।"

সুলগ্না বলল, "কী হয়েছে ইয়ার তোর? এরকম করছিস কেন?"

জিনিয়া ক্লান্ত গলায় বলল, "কালকের কাজগুলো করি। অনেক কাজ বাকি। গত কয়েক দিন রোজ তাড়াতাড়ি বাড়ি গেছি। সেগুলোও সারতে হবে। তোর আর কিছু বলার না থাকলে এখন যা।"

সুলগ্না আহত গলায় বলল, “ওকে, ওকে। কাজ কর তুই। সরি।”

সুলগ্না চলে গেল।

জিনিয়া পাথরের মতো মুখ করে কাজ করে গেল। লাঞ্চে একা একা বেরোল। সুলগ্না বেরোল তবে জিনিয়ার থেকে একটু দূরত্ব রেখে। একটা ছোটো ছাউনিতে জিনিয়া রুটি, পনির খেয়ে একা একা রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার অফিসে ফিরে এল।

সুলগ্না আবার জিনিয়ার কাছে গিয়ে বলল, “আজ ডাকলি না? একা একা খেয়ে এলি?”

জিনিয়া সুলগ্নার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার ভালো লাগছে না কিছু। তুই বুঝতে পারিস না কেন আমি এরকম করছি? আমাকে একটু একা ছাড়তে পারবি না? লিভ মি অ্যালোন। প্লিজ।”

সুলগ্না বলল, “ঠিক আছে। ছেড়ে দেব একা। আমাকে যদি মনে হয় কিছু বলার আছে তো বল। খুলে বল। যদি মনে হয় আমি তোর সিক্রেট রাখতে পারব, তাহলেই বল, নইলে বলতে হবে না। ওকে?”

জিনিয়া খানিকক্ষণ দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। সুলগ্না একগ্লাস জল এগিয়ে দিল জিনিয়ার দিকে। বলল, "জলটা খা।"

জিনিয়া জলটা পুরোটা খেয়ে নিল। তারপর বলল, "ওর বাবা মা দেরাদুন চলে যাচ্ছে।"

সুলগ্না বলল, "সৌপ্তিকের বাবা মা?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।

সুলগ্না বলল, "বেশ। তাতে কী হবে?"

জিনিয়া মাথা নাড়ল, "জানি না কী হবে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে সৌপ্তিক এটা আমার সঙ্গে ঠিক করল না। খুব বাজে করল। সেদিন আমি ওকে যেতে বারণ করেছিলাম। আমাকে উলটোপালটা বুঝিয়ে চলে গেল জানিস?"

সুলগ্না জিনিয়ার হাত ধরে নরম গলায় বলল, "ঠিক করেনি তো। খুব ভুল করেছে। কিন্তু এগুলো ওর হাতেও ছিল না, তোর হাতেও ছিল না। প্রি-ডেস্টিনড। কারও তো কিছু করার নেই বল? আর ওর বাবা-মার এখানে একা একা থাকাটাও ঠিক হত না। ওঁরা চলে গেলে ঠিক ডিসিশনই নিয়েছেন। এবার তোকেও একটা ডিসিশন নিতে হবে।"

জিনিয়া উদভ্রান্ত মুখে সুলগ্নার দিকে তাকিয়ে বলল, “কী ডিসিশন নিতে হবে? মুভ অন করার? হবে না। আমি পারব না।”

সুলগ্না মাথা নাড়ল, “স্বাভাবিক। এরকম শক থেকে বেরোতে পারা কারও পক্ষে সম্ভবও না। তবে কী বল তো, আমাদেরকেও নিজেদের একটা সেকেন্ড চান্স দেওয়া উচিত। হতে পারে, আমরা আগের মতো ভালো না থাকলেও, শান্তিটা পেতে পারি। পারসোনালি এটা আমি ফিল করি। তোকে আমি বিয়ে করতে বলছি না, বা কোনও রিলেশনে জড়াতে বলছি না। শুধু বলছি, গিভ ইওর লাইফ অ্যানাদার চান্স। দিয়ে দেখ, অন্তত একটা চেষ্টা তো কর।”

জিনিয়া কিছু বলল না। মনিটরের দিকে ফিরে আবার কঠিন মুখে কাজ করতে শুরু করল।

সুলগ্না কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠল। নিজের কিউবিকলে যাওয়ার আগে বলল, “প্লিজ কাম ব্যাক জিনিয়া। প্লিজ।”

জিনিয়া এবারেও কোনও উত্তর না দিয়ে কাজ করে যেতে থাকল।

১২

রাত আটটা নাগাদ জিনিয়া বাড়ি ফিরল। মালতী আর অগ্নি টিভি দেখছিলেন।

অগ্নি বললেন, "অফিসের গাড়ি দিয়ে গেল?"

জিনিয়া ব্যাগ টেবিলে রেখে সোফায় বসল, "হ্যাঁ।"

অগ্নি বললেন, "অফিসে সব ঠিকঠাক?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

মালতী বললেন, "ও বাড়ি গেছিলি? কী হল?"

জিনিয়া বলল, "ওরা চলে যাচ্ছে কাল। বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে।"

মালতী বললেন, "বাড়ি বিক্রি করবে?"

জিনিয়া বলল, "না। চাবি দিয়ে গেছে আমাকে। মাঝে মাঝে দেখে আসব।"

মালতী হাঁফ ছাড়লেন অগ্নির দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণেই চিন্তিত মুখে বললেন, "কিন্তু ওদের বাড়ি চুরি-টুরি হলে তোর ঘাড়ে আসবে না তো?"

জিনিয়া মার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

অগ্নি বললেন, "কোথাও ঘুরতে যাবি মা? কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না।"

জিনিয়া বলল, "কোথায় যাবে বলো?"

মালতী অবাক হয়ে অগ্নির দিকে তাকালেন।

অগ্নি বললেন, "পাহাড়ে যাবি? সিকিম? দাস আছে, বললেই টিকিট কেটে দেবে।"

জিনিয়া বলল, "তোমরা যা ঠিক করবে। মা, রুনুমাসিকেও খবর দিয়ে দাও। কোন ছেলে দেখতে আসবে বলছিলে না? আসতে বলে দাও।"

অগ্নি ভ্রূ কুঁচকালেন, "কী হয়েছে তোর? হঠাৎ করে এই ডিসিশনগুলো নিতে শুরু করলি আবার?"

জিনিয়া বলল, "তোমরা সারাক্ষণ বলছ না মুভ অন করতে? মুভ অন করি। তোমরা যদি তাতে খুশি হও, তাহলে তাই হোক।"

কথাটা বলে জিনিয়া উঠে ঘরে চলে গেল।

মালতী উত্তেজিত ভাবে চাপা গলায় অগ্নিকে বললেন, "আমি রুনুকে ফোন করে দি? এখন রাজি হয়েছে, কখন আবার অন্য কথা বলবে কোনও ঠিক নেই তো!"

অগ্নি গম্ভীর মুখে বললেন, "কোথাও কাউকে ফোন করতে হবে না। কাল সকাল অবধি দেখি। ও যদি তারপরেও বলে, তখন গিয়ে ফোন করবে। এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করছে। একটা সত্তা সৌপ্তিকের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাইছে, আর-একটা সত্তা মুভ অন করতে চাইছে। প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়ে গেছে মেয়েটা। ওকে এখন কোনওরকম জোর করবে না।"

মালতী বললেন, "তোমার রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে..."

অগ্নি বললেন, "তো কী হয়েছে? রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে তো কী হয়েছে? মেয়ে সেলফ ডিপেনডেন্ট, আমার পেনশন থাকবে, কী অসুবিধা আছে? এসব ভিক্টোরিয়ান মেন্টালিটি ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করো।"

মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "আমার হয়েছে জ্বালা। মেয়ের বাবা, মেয়ে সবার কাছে মুখঝামটা খেয়ে বেড়াই। আমি আর কী করব?"

অগ্নি বললেন, “অনেক কিছু করার আছে। মেয়ে যেগুলো খেতে পছন্দ করে সেগুলো বানাও। আর দয়া করে মেয়ের মাথাটা বিয়ে বিয়ে করে খারাপ করে দিয়ো না। একটা মেয়ের বিয়ে করা ছাড়াও অনেক কাজ থাকে সেটা বোঝার চেষ্টা করো।”

মালতী বললেন, “রুনু যে ছেলেটাকে দেখেছে, তিন্নিদের মতো প্রাইভেট অফিসের ঝঞ্ঝাট নেই। স্কুলে পড়ায়, ভালো ছেলে। ফ্যামিলিতেও ওর মা ছাড়া কেউ নেই। এক ছেলে। এরকম ফ্যামিলি পাওয়া যাবে না। পরে একটা বাজে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, মেনে নিতে পারবে তো?”

অগ্নি বললেন, “বিয়েই হবে সেটা ধরে নিচ্ছ কেন? মেয়ে বিয়ে না করে ভালো থাকতে পারে না?”

মালতী রেগে গেলেন, “এমন অলুক্ষুনে কথা বলবে না কোনও দিন।”

অগ্নি বললেন, “অলুক্ষুনের কী আছে বুঝলাম না। পৃথিবীতে সবাইকে বিয়ে করে সংসার করতে হবে? কেউ কেউ নিজের মতো থাকতে পারবে না? বাবা-মার সঙ্গে কাটাল, এদিক সেদিক ঘুরল, ইচ্ছেমতো জীবন কাটাল, সম্ভব না?”

মালতী বললেন, “আর আমরা চোখ বুজলে? তখন কী হবে?”

অগ্নি বললেন, "জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। বিয়ে দিয়ে একটা আনহ্যাপি ম্যারেড লাইফে মেয়েটাকে ঠেলে দিয়ো না। শোনো আমার কথা। আরও কদিন অপেক্ষা করো।"

মালতী বললেন, "আমি তিন্নিকে এরকম দেখতে পারছি না আর। কষ্ট লাগছে।"

অগ্নি বললেন, "কষ্ট আমিও পাচ্ছি। কিন্তু মেনে নাও। এই সময়টা তাড়াহুড়ো করার না। অপেক্ষা করার। অপেক্ষা করো। সময় দাও মেয়েকে।"

মালতী রান্নাঘরে চলে গেলেন রাগ করে। তাঁর আর অগ্নির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

১৩

সৌম্য বাবা-মার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছিল। আদিদেব টিভি দেখছেন অন্য ঘরে।

রোহিণী কেঁদে যাচ্ছিলেন। সৌম্য বলল, "কেন কাঁদছ মা? আমার ভালো লাগে তুমি এরকম করে কাঁদলে?"

রোহিণী বললেন, "সব ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতেই কেমন লাগছে রে সমু। একটা দিন, জীবনটাই পালটে দিল।"

সৌম্য চুপ করে গেল। রোহিণী বলে চললেন, “শিয়ালদায় এক কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকতাম বিয়ে করে এসে অবধি। তোর বাবা এ জমি কিনল। বাড়ি করল। তোরা বড়ো হলি। কত কিছু জড়িয়ে আছে প্রতিটা ঘরের কোনায়। ভাবলেই যে কী কষ্ট হচ্ছে! আমরা ওখানে গেলে তোর অসুবিধা হবে না বাবা?”

সৌম্য বলল, “কেন অসুবিধা হবে মা? আমি তো সবসময়ে সবাইকে নিয়ে থাকতে চেয়েছি। এতদিন হয়নি। এবার হচ্ছে। আমি এতেই খুশি। আর কী চাওয়ার থাকে বলো? কেন এসব উলটোপালটা কথা ভাবো বলো তো?”

রোহিণী বললেন, “তা তো জানি বাবা। তুই আর সতু দুজনেই পাগলা গোছের বরাবর। তোদের মতো ছেলে কি সব বাবা-মার কপালে থাকে? তাও সতুটা...” রোহিণীর কথা আটকে গেল।

সৌম্যরও চোখে জল এসে গেছিল। রোহিণী যাতে না দেখেন, তাড়াতাড়ি সেটা মুছে নিয়ে বলল, “সব মালপত্র নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা তো কলকাতাতে আর আসব না, এমন নয়। মোটামুটি কাজ চালাবার মতো যা যা লাগে নিয়ে নিচ্ছি। মা দ্যাখো তো, এই শাড়িটা নেবে কি না?”

রোহিণী বললেন, “জিনিয়ার সঙ্গে তোকেও মানাত সমু। মেয়েটা বড্ড ভালো ছিল। সতুকে বড়ো ভালোবাসত।”

সৌম্য মার দিকে তাকিয়ে বলল, “এসব কী কথা বলছ মা? সতু যাকে ভালোবাসত তাকে আমি বিয়ে করতে যাব কেন? মাথাতেই এনো না এসব কথা। তা ছাড়া আমার বিয়ে করারই ইচ্ছে নেই এ জন্মে। এসব ইচ্ছে মাথাতেও এনো না।”

রোহিণী চোখ মুছে বললেন, “জানি তো, আমিও জানি এ চিন্তার কোনও মাথামুন্ডু নেই। কিন্তু মেয়েটার ওপরে কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে যেন। এসে চুপ করে সতুর ঘরে বসে থাকবে। সতু স্কুলে কী করত, ছোটোবেলায় কীভাবে সাইকেল থেকে পড়ে গেছিল, সব গল্প খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে। এরকম ভালোবাসা আজকালকার দিনে কেউ বাসে বল তো?”

সৌম্য বলল, “সতু ভালো থাকত। তোমরাও ভালো থাকতে। কী করবে মা, কপালে নেই। আমার কাছে দুজনে থাকো এখন। খারাপ রাখব না। কলকাতা আর এই বাড়িটা মিস করবে, এই যা।”

রোহিণী বললেন, “সে তো জানি। তুই কেন আমাদের খারাপ রাখবি সমু? তবে বাবা রাগটা কমা। তোর রাগটা বড্ড লাগামছাড়া হয়ে যায় আজকাল। জিনিয়ার কাছে ভাগ্যিস ক্ষমা চেয়েছিলি, নইলে আমি আর তোর বাবা বড্ড লজ্জায় পড়ে যেতাম।”

সৌম্য বলল, “পরিস্থিতিটাই এমন, মাথা ঠিক রাখা যায় না আসলে। সব কিছু কেমন হাতের বাইরে চলে গেল।”

রোহিণী বললেন, “কথাটা ওকে আমিই বলে ফেলেছিলাম সমু। আমিও তো বুঝতে পারছিলাম না, আমরা চলে গেলে জিনিয়াকে কী বলে সান্ত্বনা দেব। দোষটা আমারই। বয়স হচ্ছে তো, কী বলতে কী বলে ফেলি বুঝি না। ও মেয়েও যে সব কথাই মাথার ভিতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কী করে বুঝব?”

রোহিণীর গলা ধরে এল।

সৌম্য বলল, “ঠিক আছে। এখন আর এ কথা ধরে বসে থাকতে হবে না। বাদ দাও।”

রোহিণী বললেন, “মনে আছে সমু, ছোটোবেলায় একটা ডিমকে দুভাগ করে তোদের দুভাইকে খাওয়াতাম ভাত আর মাখন দিয়ে। এক গ্রাস তুই, আর-এক গ্রাস সতু। গ্রাসগুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখতাম। তুই সবসময় ফার্স্ট হতিস। সতু জল খেয়ে ফেলত কতটা করে। আজকাল সারাক্ষণ এসব কথা মাথায় ঘুরপাক খায়।”

সৌম্য থমকে গেল। উঠে রোহিণীকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

১৪

শেয়ালদা স্টেশনে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হল উদ্দালকের। মা তাকে দেখেই বলল, "কত রোগা হয়ে গেছিস! খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস তুই?"

উদ্দালক বলল, "ওজন তিন কিলো বেড়েছে। কী যে বলো না!"

মা বলল, "ওরকম বলতে নেই। নজর লাগে।"

বাবা বলল, "হ্যাঁ, পারলে সারাজীবন আঁচলেই বেঁধে রাখো। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছেলেটা বিয়ে করবে না, সেটাও তোমার জ্বালাতনে শিকেয় উঠল।"

মা রেগে গেল, "একদম পিছু ডাকবে না। ভালো সিদ্ধান্ত? বুড়ো বয়সে কে ওকে খাওয়াবে?"

বাবা বলল, "বৃদ্ধাশ্রমে থাকবে। এনাফ রোজগার করে নেবে। একা থাকার মজাই আলাদা। দেশ বিদেশ ঘুরবে। বিয়ে করা মানেই ঝামেলা।"

মা বাবার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "তুমি কি চাও, আমি এখান থেকে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব? চাও?"

বাবা বলল, "ওরে বাবা থাক। খচে যেয়ো না।"

মা গজগজ করতে লাগল।

#

অগ্নি অপেক্ষা করছিলেন বারান্দায়। তাদের ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "আমি ভাড়াটা দিয়ে দি।"

উদ্দালক বলল, "না না, সে কী, এসব একদম না। আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

অগ্নি উদ্দালকের উষ্মা প্রকাশ দেখে খুশি হলেও মুখে কিছু বললেন না।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অগ্নি বললেন, "আসুন।"

তারা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসল। জিনিয়ার এক মেসো-মাসিও এসেছেন। মালতী চা দিলেন। উদ্দালক চারদিক দেখছিল। এই প্রথম তার কোথাও বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়া। অস্বস্তি হচ্ছিল। লজ্জাও হচ্ছিল। কোত্থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছিল। তার মন সেদিকে চলে গেল। সে বা পল্টু, কেউ ভালো লুচি ভাজতে পারে না। লুচি ভাজতে গিয়ে সেটা বিভিন্ন আকারের হয়ে যায়। পরোটা তাও চলে যায়।

এ কথা সে কথার পর জিনিয়া একেবারে ন্যূনতম প্রসাধনে এল। মালতীর শত অনুরোধেও জিনিয়া সাজেনি।

উদ্দালক জিনিয়ার দিকে তাকাতে পারল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। জিনিয়াও তার দিকে একবারও তাকাল না। শক্ত হয়ে বসে রইল।

আবার কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপের পরে অগ্নি বললেন, "তিন্নি, তুই উদ্দালককে নিয়ে তোর ঘরে যা। কথা বল।"

জিনিয়া উদ্দালককে না ডেকেই উঠে গেল। উদ্দালক কী বলবে বুঝতে না পেরে বাবার দিকে তাকাল। বাবা ইশারা করল জিনিয়াকে অনুসরণ করতে।

সে জিনিয়ার পিছন পিছন জিনিয়ার ঘরে গেল।

ছোটো ঘর। সম্ভবত তারা আসবে বলেই সাজানো হয়েছে। উদ্দালক দেখল খাটের ওপর নীললোহিত সমগ্র। সে খুশি হয়ে বলল, "বাহ, আপনি নীললোহিত পড়েন?"

জিনিয়া তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, পড়ি। সৌপ্তিক দিয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছিল। ও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আমার বাবা, মা বা রুনুমাসি কেউই আপনাদের এ কথা বলবে না। আমি বলে দিলাম।"

উদ্দালক বলল, “খুব খারাপ লাগল শুনে। আপনাদের লাভ ম্যারেজ হত?”

জিনিয়া মাথা উপর-নিচ করল।

উদ্দালক বলল, “স্বাভাবিক। তাহলে আপনাকে আজকে জোর করা হয়েছে?”

জিনিয়া বলল, “হুঁ। ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল। আমার কী হবে ভেবে আমার মায়ের ঘুম হচ্ছে না। সবাই বোঝাতে শুরু করেছে আমার মুভ অন করা উচিত। আমি এসবের অত্যাচার থেকে বাঁচতেই শেষমেশ রাজি হয়েছি। আমি আর এসব নিতে পারছি না।”

উদ্দালক বলল, “স্বাভাবিক। মানুষ একা ভালো থাকলে কেউ দেখতে পারে না। যেভাবেই হোক তাকে বিয়ে দিয়েই ছাড়বে। ভাবটা এমন, আমরা নিজেরা খারাপ আছি, তোরাও খারাপ থাক। অদ্ভুত ব্যাপার যাই বলুন।”

জিনিয়া এবার একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গেল।

উদ্দালক বলল, “আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কম বেশি একই। বিয়ে করতে আমারও তেমন ইচ্ছা নেই।”

জিনিয়া বলল, "আপনার কোনও অ্যাফেয়ার?"

উদ্দালক বলল, "নাহ। ওসব হয়নি। প্রচুর পড়াশোনা করেছি এক কালে। কিন্তু স্কুলে পড়ানো ছাড়া আর কোনও চাকরি পেলাম না। সে কাজও ভালো লাগে না। ছাত্র পেটানো অপেক্ষা ভ্যারেন্ডা ভাজা ভালো।"

জিনিয়া বলল, "আপনি কি আমাকে পছন্দ করবেন?"

উদ্দালক বলল, "আপনাকে পছন্দ না করলেও আগামী কয়েক মাস আমাকে মেয়ে দেখে বেড়াতে হবে। মা ছাড়বে না। আমি প্রেম-ট্রেম অত বুঝি না বুঝলেন। কাঠখোট্টা টাইপ লোক। তবে আপনার পাস্ট শুনে খারাপ লাগছে এটাও সত্যি।"

জিনিয়া বলল, "আমি কারও সিমপ্যাথি চাই না।"

উদ্দালক বলল, "আমি সিমপ্যাথাইজ করছিও না। জাস্ট বললাম।"

জিনিয়া বলল, "ওরা আমাকে পাগল ভাবে।"

উদ্দালক বলল, "কারা?"

জিনিয়া বলল, "সবাই। সৌপ্তিক চলে যাবার পর ওর বাড়ি যেতাম অফিস না গিয়ে। ওর অ্যালবামগুলো ঘাঁটতাম। ওর আলমারি গুছিয়ে দিয়ে আসতাম। ওর বাবা মা ওর দাদার কাছে দেরাদুনে চলে গেল। ওর মা বলল ওদের বাড়ি বেচতে পারে। আমি কিনব ভাবলাম হোম লোন নিয়ে। এসব শুনে আমার বাবা মা ভাবল আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি। সবাই বলে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, মুভ অন করো। সব ভুলে এগিয়ে যাওয়া এত সোজা বুঝি?"

উদ্দালক বলল, "আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবেসে তার বাড়িটা কিনে নিতে চেয়েছিলেন?"

জিনিয়া মাথা নাড়ল।

উদ্দালক নীললোহিত সমগ্র হাতে নিল। তৃতীয় খণ্ড। গোটা গোটা অক্ষরে সৌপ্তিক লিখেছিল, "তিন্নিকে সতু।"

বইটা বন্ধ করে রেখে সে বলল, "বেশ করেছিলেন। এতে কে কী বলল অত কান দেওয়ার দরকার ছিল না। যারা এতে সমস্যা দেখেছে, তাদের সমস্যা আছে।"

জিনিয়া বলল, "আমি কোনও দিন ওকে ভুলতে পারব না। যাকেই বিয়ে করি, আমি সুখী হব না।"

উদ্দালক বলল, “সেটাও অস্বাভাবিক কিছু না। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ি থেকেই কি লুচির গন্ধ আসছে?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ, মা ভাজছিল।”

উদ্দালক বলল, “এই যে যতবার ছেলে পক্ষ দেখতে আসে, আপনার মা লুচি করেন?”

জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকরা যখন এসেছিল মা করেছিল। তারপরে আপনারাই প্রথম এলেন।”

উদ্দালক বলল, “ভীষণ অপচয়। দেখুন আপনার যা অবস্থা দেখলাম, তাতে আপনাকে বাড়ির ইমোশনাল অত্যাচার সামলাতে বিয়ে করতেই হবে। আমাকেও করতে হবে। নইলে আপনাদের বাড়িতে লুচির পর লুচি হয়ে যাবে, আর আমাকে প্রতি শনি-রবিবার বাবা-মার সঙ্গে টো টো কোম্পানি করতে হবে। চলুন আমরা বিয়ে করে নি। আমি এক ঘরে শোব, আপনি আর-এক ঘরে শোবেন। ইট উইল বি লাইক এ কন্ট্র্যাক্ট। খারাপ হবে?”

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কিন্তু কোনও দিন ভুলেও আমাকে ছুঁতে দেব না। আর সৌপ্তিকের বাড়ির চাবি আমার কাছে আছে। মাঝে

মাঝেই আমি সে বাড়ি যাব। আমি ওকে নিয়েই সারাজীবন কাটাব। আপনার কোনও আপত্তি থাকবে তাতে?”

উদ্দালক মাথা নাড়ল, “একেবারেই নয়। আমি অঙ্কের লোক। শান্তিপ্রিয়ও বটে। আপনাকে আমার ঠিকঠাক লাগছে। আমার আপনাকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই। আপনি করবেন?”

জিনিয়া বলল, “আমি কিন্তু যে শর্তগুলো বললাম, একদম স্ট্যাম্প পেপারে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নেব। আপনারও কোনও শর্ত থাকলে সেগুলো আপনি আমাকে বলতে পারেন। আমিও সই করে দেব।”

উদ্দালক বলল, “শর্ত একটাই। আপনি আমার প্রাইভেসিতে ঢুকবেন না। আমিও আপনার এরিয়ায় ঢুকব না। ডান?”

জিনিয়া উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে কিচ্ছু না ভেবে বলল, “ডান।”

১৫

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে তারা বেরোল জিনিয়াদের বাড়ি থেকে। ট্যাক্সিতে উঠেই মা জিজ্ঞেস করল, “অত কী কথা বলছিলি রে বাবু?”

বাবা বলল, "সেটা ও কেন বলতে যাবে? নিশ্চয়ই প্রাইভেট কোনও কথাই হবে।"

মা বলল, "এখন প্রাইভেট কোনও কথা হয় না। যা হয় বিয়ের পরে। সবাই মিলেই তো ঠিক করতে হবে।"

উদ্দালক বলল, "এখানেই বিয়ে করব। কথা এগিয়ে নাও।"

মা বলল, "মানে? তুই-ই ঠিক করে নিলি? কী এমন কথা হল?"

উদ্দালক বলল, "কথার কিছু না। প্রতি শনিবার সিএল নিয়ে তো মেয়ে দেখতে যাওয়া সম্ভব না। এই মেয়েকেই বিয়ে করে নেব। ঠিকঠাক লেগেছে।"

বাবা খুশি হয়ে বলল, "দ্যাখো, ছেলে আমার মতো হয়েছে। তুমি তো মেয়ে পছন্দ করছ না শাড়ি পছন্দ করছ বুঝেই উঠতে পারি না। দেখেই যাবে, দেখেই যাবে। তারপর সবথেকে ওঁচা শাড়িটা নিয়ে ঘরে আসবে।"

মা বলল, "আমি ওঁচা পছন্দ করি? আর তুমি? নিজে যে জামাগুলো পরো সেগুলো কে পছন্দ করে দেয় তোমায়?"

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখে উদ্দালক বলল, "শোনো, এখন রাস্তাঘাটে ঝগড়া করে তো লাভ নেই। বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া কোরো।"

মা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ মানে যে কত চিন্তা তা যদি তুই বুঝতি! পৃথিবীর সবাই লাভ ম্যারেজ করে বাচ্চার বাবা হয়ে গেল, আর তোর জন্য টাকা খরচা করে মেয়ে দেখতে আসতে হচ্ছে। তোর লজ্জাও লাগে না।"

উদ্দালক বলল, "আমার প্রেম-ট্রেম পোষায় না। প্রেম করেই বা কটা লোক ভালো আছে? তোমাদের তো প্রেম করে বিয়ে। ভালো আছ নাকি তোমরা? সারাক্ষণ ঝগড়া করে যাচ্ছ।"

মা ধমক দিল, "তোকে অত বুঝতে হবে না। ঝগড়াটাও ভালো থাকার মধ্যেই পড়ে। অত বুঝলে তো হয়েই যেত। কী গো, ঠিক বলছি তো?"

বাবা খুক খুক করে কাশতে কাশতে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা খুব ভালো আছি। শুধু তোর মা একটু বকাঝকা বেশি করে এই যা।"

মা বলল, "কী? আমি বকাঝকা করি?"

বাবা হাসতে লাগল, উদ্দালক, সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারও।

মা বলল, "ঠিক আছে, আমি মেয়ের মাসিকে খবর দিচ্ছি, ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যাক। ওরা একবার আসুক আমাদের বাড়ি। তোর স্কুলেও যদি ভেরিফিকেশনের জন্য যায়, ঘুরে আসুক। তবে মনে হয় না অত কিছু করবে। ভদ্র ফ্যামিলিই মনে হল। তবু তোর মাসিদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব। একটা বিয়ে মানে অনেক ঝামেলা।"

উদ্দালক বলল, "কোনও ঝামেলা না। বিয়ে করব ঠিক করলেই বিয়ে হয়। অত চিন্তা করতে হবে না। তোমরা হ্যাঁ বলে দাও।"

মা গালে হাত দিল, "সে কী রে, একদিন দেখে এসেই মেয়ের বাড়ির হয়ে কথা বলা শুরু করেছিস! বিয়ের পরে তো পুরো বউয়ের আঁচলে বাঁধা পড়বি বাবু!"

উদ্দালক হাসল, "তা পড়ব। বিয়ে দিচ্ছ যখন, জোর করেই দিচ্ছ যখন, তখন এসব হ্যাজার্ড তো নিতেই হবে মা।"

মা বাবার দিকে তাকাল, "শুনলে তোমার ছেলের কথা? শুনলে?"

বাবা বলল, "ঠিকই তো বলেছে। বউয়ের ন্যাওটা হলে তো লোকে ভালোই থাকে। আমি কি খারাপ আছি?"

মা বলল, “হুহ। তুমি নাকি বউয়ের ন্যাওটা। তাস খেলতে গেলে আমার ডাকটুকু শুনতে পাও না, এসেছেন আমার ন্যাওটা হতে। ফালতু কথা বোলো না তো একদম। তুমি যেখানে যেখানে যোগাযোগ করার করো। খবর নাও এই মেয়েটা কেমন। পরিবার কেমন। তোমার বন্ধু পুলিশে আছে না? খবর নাও। বিয়ের পর ফোর নাইন্টি এইট যেন না খাই বাবু। খুব ঝামেলা।” মা দু হাত তুলে প্রণাম করল।

বাবা বলল, “বাবা! তুমি জেল অবধি ভেবে নিলে? সাধে কি তোমায় ত্রিকালদর্শী ভাবি?”

মা কটমট করে বাবার দিকে তাকাল।

#

স্টেশন পৌঁছে মা একচোট কান্নাকাটি করল। “ভালো থাকিস বাবু, ঠিক করে খাওয়াদাওয়া করিস। একদম নিজের খেয়াল রাখিস না। ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবি তো? বল?”

উদ্দালক মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “সব রাখব। তোমরা সাবধানে যাও।”

বাবা আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাকে বলল, “এ বাড়িই ফাইনাল তো?”

উদ্দালক ঘাড় নাড়ল, “হ্যাঁ।”

বাবা হাঁফ ছেড়ে বলল, “বাঁচালি বাবা! এ বয়সে দৌড়াদৌড়ি কি আর পোষায়? তাও আজকের তাসের আড্ডাটা মনে হয় গেল।”

বাবার গলা শেষটায় বিমর্ষ শোনাল।

উদ্দালক হেসে ফেলল।

১৬

সন্ধে নাগাদ স্টেশনে নেমে উদ্দালক দেখল পল্টু একটা বাইক নিয়ে হাজির হয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, “বাইক কোত্থেকে পেলি তুই?”

পল্টু বলল, “কাকুর বাইক। উঠুন স্যার। ঝড়ের বেগে নিয়ে যাব।”

উদ্দালক বলল, “খেপেছিস? তোর লাইসেন্স আছে?”

পল্টু বলল, “লাইসেন কী স্যার?”

পল্টু অবাক পৃথিবী মোড়ে চলে যায় মাঝে মাঝেই। এমন একটা মুখ করে প্রশ্নটা করল, দেখে উদ্দালকের হাসি পেয়ে গেল।

সে বলল, "তুই পিছনে বস। আমাকে চালাতে দে।"

পল্টু বলল, "ঠিক আছে স্যার। আপনি চালান।"

উদ্দালক গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। পল্টু বসে বলল, "স্যার কি বিয়ে করতে গেছিলেন?"

উদ্দালক বলল, "একদিনে কে বিয়ে করে রে পল্টু?"

পল্টু বলল, "বিনোদ করেছে স্যার। মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফোন করেছে বিয়ে করে ফেলেছে নাকি। হেবি ঝামেলা চলছে এলাকায়।"

উদ্দালক বিষম খেয়ে বলল, "বিনোদের কত বছর বয়স?"

পল্টু বলল, "কত আর, চোদ্দো-পনেরো হবে। মেয়েটার এগারো।"

উদ্দালক বলল, "বাহ। খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিনোদ। বিনোদের বাবা কী বলছে?"

পল্টু বলল, “বিনোদের বাপ বলছে শুয়োর মারার গরম রড ছেলের পিছনে ঢোকাবে। ওর মা কান্নাকাটি করছে। সব মিলিয়ে হেবি ঝামেলা।”

হাসতে হাসতে উদ্দালক আর-একটু হলেই বাইক নিয়ে পড়ছিল। চৌরাস্তার মোড় এলে উদ্দালক বাইক থামিয়ে বলল, “দাঁড়া চা খেয়ে নি। তুই কী খাবি?”

পল্টু বলল, “আমিও চা খাই। মালাই চা খান স্যার। ভালো করে।”

উদ্দালক দুটো মালাই চা নিল।

পল্টু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, “স্যার বউদি চলে এলে কি আমাকে আর পড়াবেন না?”

উদ্দালক বলল, “কেন পড়াব না? সব চলবে যেমন চলছিল।”

পল্টু খুশি হয়ে বলল, “তাহলে ঠিক আছে স্যার। নইলে আমি অশিক্ষিত থেকে যাব।”

উদ্দালক পল্টুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, “তুই আজকাল যা অঙ্ক করছিস তাতে এখনও তোকে শিক্ষিত বলা যাবে না পল্টু।”

পল্টু মাথা চুলকে বলল, “শিখে নেব স্যার। চিন্তা করবেন না।”

উদ্দালকের ফোন বাজছিল।

উদ্দালক দেখল বাড়ি থেকে ফোন আসছে। চায়ের ভাঁড়টা এক চুমুকে শেষ করে সে ফোনটা ধরল, "হ্যালো।"

মার গলা ভেসে এল, "পৌঁছে গেছিস বাবু?"

উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ মা। এই তো চৌরাস্তায় চা খাচ্ছি।"

মা বলল, "শোন, পরের শনিবার ছুটি নিবি। আসানসোল যেতে হবে। বর্ণালী একটা সম্বন্ধ এনেছে। এ মেয়ে ক্যানসেল।"

উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কেন? এ মেয়ে ক্যানসেল কেন? কী হয়েছে?"

মা বলল, "আরে সে অনেক কাণ্ড। এখনই জানতে পারলাম। এ মেয়ের আগে প্রেম ছিল। সে ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এরকম বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না। একে তো প্রেম ছিল, তার ওপর অপয়া মেয়ে।"

উদ্দালক বলল, “সে জানি তো। জিনিয়া আমায় সে কথা বলেছে তো। তাতে কী হয়েছে? সাইন্সের স্টুডেন্ট হয়ে পয়া অপয়া মানব কেন? তাহলে পড়াশোনা করতে গেলাম কেন মা?”

মা বলল, “আমি জানি না, তুই এই বিয়ে করবি না।”

উদ্দালক কয়েক সেকেন্ড থমকে গিয়ে বলল, “আমিও আর কোনও মেয়ে দেখতে যাব না। বিয়ে করলে এই মেয়েকেই করব, আর নইলে কোনও দিন করব না।”

মা বলল, “মানে? আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই তোর কাছে?”

উদ্দালক বলল, “অবশ্যই দাম আছে মা। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে কোনও মেয়ের এক্স মারা গেছে বলে তাকে বিয়ে করা যাবে না, এরকম কুযুক্তির জন্য আমি আমার সিদ্ধান্ত পালটাতে পারব না। আমি তোমাকে বলে দিলাম, বিয়ে করলে এই বাড়িতেই করব। তোমরা কথা এগোও।”

মা বলল, “আমার তোকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। আগেই জেনেশুনে নিয়ে ক্যানসেল করা উচিত ছিল। যাওয়াটাই উচিত হয়নি।”

উদ্দালক বলল, “মেয়েটা কিন্তু আমাকে শুরুতেই বলেছে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল, ছেলেটা মারা গেছে। কোনও তথ্য গোপন করেনি আমার কাছে। তুমি কথা এগোও। আমি এ বাড়িতেই বিয়ে করব। আর কোনও মেয়েও দেখতে যেতে পারব না।”

মা রেগেমেগে ফোন কেটে দিল।

পল্টু কান খাড়া করে সব কথা শুনছিল। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার স্যার? খুব বাওয়াল?”

উদ্দালক দোকানে তার জন্য আর-এক কাপ চা অর্ডার করে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “হ্যাঁ রে পল্টু, খুব বাওয়াল। আজ লুচি খাবি? আর-একবার চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে, কী বলিস?”

পল্টু দাঁত বের করে রাজি হয়ে গেল।

১৭

রবিবার সকাল।

বাজারে যেতেই সুদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উদ্দালকের। সুদেববাবু তাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, “কী হে, কী খবর মাস্টার? কাটিয়ে দিয়েছ তো কলকাতার সম্বন্ধটা?”

উদ্দালক বলল, “ওই আর কি।”

সুদেব বললেন, “তাহলে আজ রাতেই চলে এসো। বাজার তো করেই নিচ্ছি। কী বলো?”

উদ্দালক বলল, “আজ একটু সমস্যা আছে সুদেববাবু। পরে কোনও এক দিন হবে।”

সুদেব বললেন, “কী সমস্যা? আমাকে বলো।”

উদ্দালক শ্বাস ছাড়ল। এরা প্রাইভেট স্পেস বলে কিছু আছে বুঝতে চায় না। সে বলল, “আছে কিছু একটা। আজ হবে না।”

সুদেব বললেন, “ঠিক আছে। জানিয়ো। আজ কিন্তু ভালো পাবদা উঠেছিল।”

উদ্দালক বলল, “আমি পাবদা খাই না।”

সুদেব হাঁ করলেন, “পাবদা খাও না? আড় মাছ?”

উদ্দালক মাথা নাড়ল।

সুদেব বললেন, “তাহলে চিংড়ি? আগের দিন তো বললে চিংড়ি খাও?”

উদ্দালক বলল, “না। আমার অ্যালার্জি ধরা পড়েছে। চিংড়ি খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি।”

সুদেব তার আগাপাশতলা দেখে বললেন, “অ। ঠিক আছে। তোমরা আজকালকার দিনের ছেলেপিলে। তোমাদের ঠিক বুঝতে উঠতে পারি না বাপু। কখন যে কী বলো কিছুই বুঝি না। ঠিক আছে।”

সুদেববাবু তাকে না ঘাঁটিয়ে চলে গেলেন। উদ্দালক হাঁফ ছাড়ল। একটা জ্যান্ত কাতলা নিয়ে বাজার থেকে বেরোতে যাবে, দেখল বাবা ফোন করছে। ধরল, “বলো।”

বাবা বলল, “কাল তো সব শুনলাম। তোর মা খুব রাগারাগি করছে। সে নাহয় আমি সামলে নেব। কিন্তু তুই আমাকে বল দেখি, তুই শিওর তো?”

উদ্দালক মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক প্লেট কচুরি আর দুটো রসগোল্লা অর্ডার করে বলল, “হ্যাঁ, শিওর।”

বাবা বলল, "তোর মা মাঝে মাঝে পাগলের মতো করে ঠিকই, কিন্তু তোকে নিয়ে চিন্তাও করে। এতদিন বিয়ে করিসনি। তার ওপর তুই মফস্সলের ছেলে। কলকাতার মেয়ের সঙ্গে সংসার করতে পারবি তো?"

উদ্দালক বলল, "এ তো কোনও বিগ বস খেলা হচ্ছে না বাবা। একটা বিয়ে হবে। মেয়েটা আমাকে ওর সমস্যার কথা আগেই বলে দিয়েছিল। আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া মেয়েদের এরকম কমোডিটি বানিয়ে মেয়ে দেখার নামে এইসব অসভ্যতা আমার পোষায় না কোনও কালেই। আমি ঠিকই করেছিলাম, যে মেয়েকে প্রথম দেখব তাকেই বিয়ে করব। আর ডিসপুটের কোনও ব্যাপার নেই। মেয়েটা একজনকে ভালোবাসত। ঠিক আছে। তাতে সমস্যা কোথায়?"

বাবা বলল, "তোর জন্য গর্ব হয় আমার। তোকে একটা কথা বলি, থিওরিটিক্যালি তুই ঠিক। একশো ভাগ ঠিক। তবে মেয়েটা যদি তোকে কোনও দিন ভালো না বাসে, সেক্ষেত্রেও তো সমস্যায় পড়বি।"

উদ্দালক বলল, "ভালোবাসতেই হবে এরকম কোনও মাথার দিব্যি আমি দিচ্ছি না বাবা। না হলে না হবে। সব বিয়েই কি উত্তীর্ণ হয়?"

বাবা বলল, "জেনেশুনে বিষ পান করতে চাস? কী কারণে?"

উদ্দালক বলল, "কোনও কারণ নেই। শুধু আগে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল বলে বিয়ে ক্যানসেল করে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা আমি অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না, এটা বলতে পারি।"

বাবা বলল, "ঠিক আছে। আমি তোর মাকে বোঝাচ্ছি। রাজি করিয়ে নেব ঠিক, কবে বিয়ে করতে চাস বল।"

উদ্দালক বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। করতে যখন হবেই, তখন দেরি করে লাভ নেই।"

বাবা বলল, "বেশ। কথা বলছি আমি। ওদেরও আমাদের বাড়ি আসতে বলছি।"

উদ্দালক ফোন রেখে কচুরি খেয়ে নিল।

ফিরে রান্না বসাল। মাছের ঝোল আর ভাত। রান্না হয়ে গেলে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে সিলিং দেখায় মন দিল। এটা তার প্রিয় কাজ। টিকটিকি দেখতে ভালো লাগে তার। শিকারের সামনে কী করে এত অবিচল, শান্ত থাকে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িওয়ালা সদাশিববাবু ভালো মানুষ। বেশি জ্বালাতন করেন না। মাস্টার বলে সম্মানও করেন যথেষ্ট। এ এলাকায় আর কিছু না থাক, শিক্ষকদের সম্মান আছে।

লুঙ্গি পরে সদাশিববাবু তারে কাপড় মেলছিলেন। জানলা দিয়ে তার দিকে চোখ পড়ায় বললেন, "মাস্টারবাবু, আপনি কবে আমার দলে ভিড়বেন? আপনাকে এরকম শুয়ে থাকতে দেখে আমার ভারী হিংসা হয় যা বলুন।"

উদ্দালক হেসে ফেলল, "মনে হচ্ছে আর বেশিদিন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব না। আমারও সমন এসে পড়েছে।"

সদাশিববাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "হায় রে, সুখে থাকতে কেন যে ভূতে কিলোয় মানুষকে। অ্যাদ্দিন দিব্যি ছিলেন, চোখের সামনে আপনাকে বলি হতে দেখতে হবে। তা এ বাড়িতেই সংসার করবেন তো, নাকি অন্য বাড়ি দেখতে শুরু করেছেন?"

উদ্দালক বলল, "কেন, বিয়ে করে আপনার বাড়িতে থাকলে সমস্যা আছে?"

সদাশিববাবু লজ্জিত হয়ে হাসলেন, "না না, আমি কি তাই বলতে চেয়েছি নাকি? আমি বলছি বউমাকে নিয়ে এই কটা ঘরে থাকতে পারবেন?"

উদ্দালক বলল, "খুব ভালোভাবে থাকব।"

সদাশিববাবু বললেন, "ঠিক আছে। তবু কোনও অসুবিধে হলে বলবেন। অবশ্য আমার গিন্নি আছে। বউমার অসুবিধা হবে না কোনও।"

উদ্দালক হাসল। বাস্তবিকই এমন ভালো বাড়িওয়ালা পাওয়া যায় না। নিঃসন্তান দম্পতি। বাড়িতে কিছু ভালো রান্না হলে তাকে দিয়ে যাবেন ভদ্রমহিলা। এমন আন্তরিকতা আজকালকার দিনে বিরল হয়ে যাচ্ছে।

পল্টু সাইকেল নিয়ে এল। উদ্দালক বলল, "কি রে, তুই এখন কি অঙ্ক করতে এলি?"

পল্টু বলল, "স্যার মাছ ধরতে দিচ্ছে বড়ো পুকুরে। যাবেন নাকি?"

উদ্দালক বলল, "মাছ ধরা আমার পোষায় না। গিয়ে কী করব?"

পল্টু বলল, "মাছ ধরবেন। তিনশো টাকা এন্ট্রি ফি। যে যা মাছ পাবে, তার।"

উদ্দালক বলল, "ধুস, তুই যা। আমার পোষাবে না।"

পল্টু মুখ কালো করে চলে যাচ্ছিল। উদ্দালক পিছু ডাকল, “ঠিক আছে চ। তবে ছিপ তুই-ই ফেলিস। ওসব আমার দ্বারা হবে না।”

সঙ্গে সঙ্গে পল্টুর মুখে যেন টিউবলাইট জ্বলে উঠল।

১৮

অফিস থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা ক্যাফেতে বসল। অফিসে ব্যক্তিগত কথা বেশি আলোচনা করা সম্ভব হয় না। কথা বললেই চারপাশ থেকে কৌতূহলী কান পেতে সবাই বসে থাকবে।

কফি অর্ডার করার পরেই সুলগ্না অবাক চোখে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আর ইউ সিরিয়াস? তুই বিয়ে করবি?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ। কেন? প্রবলেম কী আছে এতে?”

সুলগ্না বলল, “আমার কেমন ঘেঁটে যাচ্ছে সব কিছু। এত তাড়াতাড়ি?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ। বাড়ি থেকে মারাত্মক প্রেশার আসছে। বাবার চাপ আছে, মায়ের চাপ আছে। নেওয়া যাচ্ছিল না আর।”

সুলগ্না বলল, "তুই পারবি? মানে সংসার করতে পারবি?"

জিনিয়া বলল, "সংসার তো করব না। ইট উইল বি ওয়ান টাইপ অফ এগ্রিমেন্ট। উদ্দালকের বাড়ি থেকে প্রেশার আছে বিয়ে করার, আমার বাড়ি থেকেও প্রেশার আছে। সো উই ডিসাইডেড টু স্টে টুগেদার। দ্যাটস ইট। কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজ বলতে পারিস। সৌপ্তিককে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব না। বাড়ির প্রেশার না থাকলে আমি এ বিয়ের ঝামেলায় যেতাম না। বাড়ি গেলেই বাবা-মার গম্ভীর মুখ, মার কথায় কথায় সেন্টু দেওয়া, আমি আর নিতে পারছিলাম না জাস্ট।"

সুলগ্না বলল, "আর ইউ শিওর, দিস ম্যান, উদ্দালক... এই কন্ট্র্যাক্ট মেনে চলার ম্যাচিওরিটি দেখাতে পারবে?"

জিনিয়া মাথা নিচু করে বলল, "প্রোপোজালটা ও-ই দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছে পারবে। দেখা যাক। না পারলে আমাকে অন্য রাস্তা দেখতে হবে। তখন আর বাড়ি ফিরব না। শহরের বাইরে কোথাও ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসব। নইলে হয়তো সৌপ্তিকদের বাড়িতে যদি থাকতে দেয়, সেখানে থাকব।"

সুলগ্না বলল, "আর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস আসবি নাকি তুই?"

জিনিয়া বলল, "দেখা যাক কী করি। ভাবিনি এখনও। মিটে যাক সব কিছু। শোন না, সৌপ্তিকদের বাড়ির ওদিকে একটা নার্সারিতে গেছিলাম। কয়েকটা গাছ পুঁতব ঠিক করেছি। এই উইকএন্ডে যাবি? একা চাপ হয়ে যাবে।"

সুলগ্না কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "ম্যান, ইউ আর সো ফাকড আপ। তুই কী করছিস, কেন করছিস, নিজেও বুঝতে পারছিস না।"

জিনিয়া বলল, "তুইও বলবি তো আমি পাগল হয়ে গেছি? বল। একশোবার বল, আমি কিচ্ছু বলব না। না গেলে যাস না। আমি একাই যাব। আগের দিন গিয়ে সৌপ্তিকের ঘর পরিষ্কার করলাম। প্রাইমারি স্কুলে সবকটা পরীক্ষায় ও ফার্স্ট হত। সেই রেজাল্টগুলো গুছিয়ে রাখলাম। এইগুলো নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।"

সুলগ্না জিনিয়ার কাঁধে হাত রাখল, "আমি তোকে বুঝতে পারি। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আর-একটা যেটা করতে যাচ্ছিস, সেটা ঠিক না ভুল, আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। দেখিস, সেটাও যেন দুঃস্বপ্ন না হয়ে যায়।"

জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকের খবরটা শোনার পর থেকে আমি আর নিজের মধ্যে নেই। যা করি, করতে হয় বলেই করি। সুইসাইড করা পৃথিবীর কঠিনতম কাজগুলোর একটা আর এত কিছুর পরেও আমার মনে হয় বাবা-মার প্রতি কিছু হলেও কর্তব্য করা বাকি আছে আমার। শুধুমাত্র এ কারণেই সেটা করে উঠতে পারিনি। নইলে..."

সুলগ্না বলল, “ভুলেও ভাবিস না। সুইসাইড ইজ নট দ্য সলিউশন। তাহলে পৃথিবীর সবাই সুইসাইড করে বেঁচে যেতে পারত। মরতে সবাইকেই হবে, তা বলে কাপুরুষের মতো মরাটা কখনও সলিউশন হতে পারে না। আচ্ছা, এই উদ্দালক ছেলেটা কেমন দেখতে? হ্যান্ডু?”

জিনিয়া বলল, “দেখিনি ভালো করে। খেয়ালই ছিল না।”

সুলগ্না বলল, “ছেলেটাই তোকে প্রোপোজালটা দিয়েছে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। ব্যাটারও কোনও অ্যাফেয়ার ছিল নাকি? বা অন্য কোনও কেস না তো? গে না তো?”

জিনিয়া কাঁধ ঝাঁকাল, “জানি না। থাকলে থাকবে। আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার আর সৌপ্তিকের স্মৃতির মাঝে এক্সক্ল্যামেট্রি সাইন হয়ে না দাঁড়ালে আমি কিচ্ছু বলব না, ব্যস।”

সুলগ্না বলল, “বুঝেছি। রিলেশন, উইদাউট ইমোশন। তাই তো?”

জিনিয়া ম্লান হাসল, “রাইট।”

পর্ব ২

১

বউভাত।

রাত দেড়টা বাজে।

উদ্দালকের ভাইবোনেরা হইহই করে উদ্দালককে ফুলশয্যার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল। বাইরে অনেকেই আড়ি পাতছে।

উদ্দালক ধমক দিয়ে সবাইকে তাড়াল।

ঘরে ঢুকে এসির তাপমাত্রা আরও কমিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার গরম লাগছে না?"

জিনিয়া বলল, "লাগছে।"

উদ্দালক বলল, "তাহলে চেঞ্জ করে নিন। আমি মেঝেতে শুয়ে নিচ্ছি। বিছানা আনিয়ে রেখেছি। প্রচুর পরিশ্রম হল। মাংসটা আপনাদের বাড়িতেই বেশি ভালো হয়েছিল। সাধে কি বলে কলকাতার রান্না? ব্যাপারই আলাদা। মিষ্টিটাও বড্ড ভালো। কোথাকার ছিল?"

জিনিয়া বলল, "আমাদের বাড়ি গেলে দেখিয়ে দেব। বলছি, আমাকে একবার ও বাড়ি নিয়ে যাবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই বিয়ের ঝামেলায় যাওয়া হচ্ছে না। সৌপ্তিকের ঘরটা নোংরা হয়ে গেছে মনে হয় অ্যাদ্দিনে।"

উদ্দালক মেঝেতে তোশক পেতে বিছানা করে নিয়ে বালিশে আরাম করে শুয়ে বলল, "একদম। ওসব ভাববেন না। কলকাতা ঘোরাও হবে। খাওয়াদাওয়াও হবে। কত জায়গা আছে।"

জিনিয়া বলল, "আমি তো বেশি ঘুরতে ভালোবাসি না। আমি ওদের বাড়িতে থাকব, আপনি ঘুরে নেবেন, ঠিক আছে?"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। আচ্ছা শুনুন, ফুলশয্যায় নাকি বউকে আংটি দিতে হয়। আমি কিনতে ভুলে গেছিলাম। মা কিনে দিয়েছে। এটা আপনি খুব অসুবিধা না হলে পরে থাকুন।"

উদ্দালক পকেট থেকে আংটি বের করে জিনিয়াকে দিল।

জিনিয়া নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তবে আমি এ বাড়িতে সিঁদুর পরলেও আপনার ওই ভাড়াবাড়িতে গিয়ে সিঁদুর পরতে পারব না। আশা করি জোর করবেন না।"

উদ্দালক বলল, "প্রশ্নই ওঠে না জোর করার। বিয়ের ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছেন আপনি আমায়। আমি তো কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আচ্ছা, আমি ঘুমালাম। গুড নাইট।"

উদ্দালক পাশ ফিরল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

জিনিয়া অবাক হয়ে গেল।

অদ্ভুত লোক তো! সৌপ্তিক চলে যাবার পর রাতের পর রাত তার ঘুম হয় না। এদিকে এ শুল আর ঘুমিয়ে পড়ল? পৃথিবীতে এরকম মানুষও আছে?

কেমন হালকা নাকও ডাকছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ঘর সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে চেঞ্জ করে এল। বিয়েবাড়ির সানাই এখনও মৃদু শব্দে বাজছে। জিনিয়ার চোখে জল চলে এল। সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে এই রাতটাই কত আনন্দময় হয়ে উঠতে পারত।

বাইরে থেকে লোকের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। কাজের বাড়ি। অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছে। তাদের ঘুমানোর তোড়জোড় চলছে। সে আর উদ্দালক সব কিছু মেনে বিয়ে করেছে। তেমনই চুক্তি হয়েছিল। যে যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ফটোগ্রাফার যতবার হাসতে বলেছে সে নিক্তিতে মেপে হেসেছে।

সবার বউ ভারী পছন্দ হয়েছে। তার সামনেই বলেছে মুখ ভারী মিষ্টি। জিনিয়ার মন পড়ে আছে সৌপ্তিকের বাড়িতে। কী হচ্ছে কে জানে। একজন লোক ঠিক করে রাখা আছে রাতে ঘুমানোর জন্য। তাতে অন্তত চুরিটা হবে না।

সালোয়ার পরেছে সে। হাতে বিয়ের একগাদা চুড়ি, শাঁখাবাঁধানো, পলাবাঁধানো শব্দ করছে। এই শব্দটা এককালে তার ভারী প্রিয় ছিল। পিসতুতো দাদা বিয়ের ঠিক পরে তাদের বাড়ি এসেছিল। বউদির হাতে চুড়িগুলো শব্দ করছে, কী ভালো লাগছিল। সে ঠিক করেছিল বিয়ের পরেও সে হাত বেশি খালি রাখবে না। সারাক্ষণ সব চুড়ি পরে থাকবে।

এখন সব গয়না খুলে রেখে দিল। গয়নাপ্রিয় জিনিয়ার গয়নার উপর কোনও মোহই নেই এখন আর। বিনা কারণেই দু চোখ ভরে জল এল। সব কিছু কেমন ছারখার হয়ে গেল। স্বপ্নগুলো দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল।

ফোনের হিডেন ফোল্ডারে রাখা তার আর সৌপ্তিকের ফটোগুলো দেখে চলল সে। যত দেখতে থাকল, তত কাঁদতে থাকল। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ উদ্দালক উঠে ঘরে রাখা জলের বোতল থেকে অনেকটা জল খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার ঘুম আসেনি এখনও?"

জিনিয়া বলল, "আমার ঘুম আসে না। নিশাচর হয়ে গেছি আজকাল।"

উদ্দালক বলল, "সে কী? না ঘুমালে অনেক রোগ হয় তো।"

জিনিয়া বলল, "জানি। কী করব বলুন? আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।"

উদ্দালক বলল, "ঘুমাব। আমার তো ইচ্ছাঘুম। চোখ বুজলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আপনি না ঘুমালে আমার অস্বস্তি হবে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, জেগেই যখন আছেন, একটা কাজ করি দাঁড়ান।"

জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "কী?"

উদ্দালক বলল, "দাঁড়ান না। আসছি।"

দরজা খুলে উদ্দালক বেরোল। কয়েক মিনিট পরে আইসক্রিমের একটা বড়ো বার নিয়ে এসে বলল, "চলুন, দুজনে মিলে মেরে দি। বেঁচে গেছে জিনিসটা। খান খান। ভ্যানিলা ভালো লাগে না?"

জিনিয়া বলল, "না না, থাক না।"

উদ্দালক প্লেট আর ছুরি নিয়ে এসেছিল। বার থেকে কেটে আইসক্রিম প্লেটে রেখে চামচ দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে জিনিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "খেয়ে নিন। লজ্জা করে লাভ নেই। আইসক্রিম সামনে রেখে না খেলে ঠাকুর পাপ দেয়। আপনি তো পল্টুকে চেনেন না। পল্টু একাই এই বার দুটো মেরে দেবে। চ্যাম্পিয়ন ছেলে। অথচ সারাদিন দৌড়োচ্ছে, ঘুরছে, সাঁতার কাটছে, শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। আর শহরের লোক কত কিছু ভেবে খাওয়াদাওয়া করে। এই ক্যালোরি বেড়ে যাচ্ছে, এই ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে, কার্বোহাইড্রেট কন্ট্রোল করো, বাপরে।"

উদ্দালক এমন করে কথাটা বলল, জিনিয়ার হাসি পেল। সে অল্প হেসে সামলে নিয়ে আইসক্রিমের একটু মুখে দিল। সেই সাড়ে বারোটার সময় খেয়েছে। ঠুসে খাইয়েছে সবাই বেশি আদর দেখিয়ে। জিনিয়া তবু খেতে পারেনি তেমন। এখন আইসক্রিমটা খেতে অমৃতের মতো লাগল। উদ্দালক তার নিজের ভাগের আইসক্রিমটা খেয়ে প্লেটটা খাটের তলায় রেখে বলল, "আপনার খাওয়া হয়ে গেলে এখানেই রেখে দেবেন। আমি সকালে ম্যানেজ করে পাচার করে দেব।"

জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে।"

উদ্দালক আবার শুয়ে পড়ল। পড়া মাত্রই আবার ঘুম। জিনিয়া হতাশ চোখে উদ্দালকের দিকে তাকাল। ভীষণ হিংসে হল। এত সহজে কেউ কী করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

২

জিনিয়ার রাতে ঘুম হয়নি। ভোর পাঁচটার দিকে উঠোনে শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখল উদ্দালকের মা একাই উঠোন ধুচ্ছেন। তাকে দেখে বললেন, "তুমি ঘুমোওনি?"

জিনিয়া বলল, "ঘুম আসছিল না।"

উদ্দালকের মা বললেন, "ও হয়। নতুন জায়গা তো। কোনও অসুবিধা হয়নি তো কাল রাতে?"

জিনিয়া বলল, "না।"

উদ্দালকের মা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হুঁ।"

জিনিয়া বুঝল ভদ্রমহিলা অন্য কিছু বলতে চাইছিলেন। সে বলল, "খুব টায়ার্ড ছিলাম।"

উদ্দালকের মা বললেন, "সে যাই হোক, আমাদের বয়স বাড়ছে। নাতি নাতনি যাই হোক, তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়। ছেলে তো ধনুকভাঙা পণ করে বসল বিয়ে করলে তোমাকেই করবে।"

ঝাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মহিলা। জিনিয়া বলল, "আমি হেল্প করব?"

মা বললেন, "না, না। আমি করে নিচ্ছি। এত লোক, ধুলোবালি গিজগিজ করছে উঠোনে। পারা যায় না। তোমাকে তো আমার কিছু জিজ্ঞেস করাও হয়নি। রান্নাবান্না পারো কিছু? আগেকার দিন হলে বউমাকেই বউভাতে রান্না করতে হত। এখন আর সেই দিন নেই। ক্যাটারার এসে গেছে।"

জিনিয়া বলল, "পারি। রান্না করতে আমার ভালো লাগে।"

মা বললেন, "তাও ভালো। আমি তো জানতাম কলকাতার মেয়ে মানে ম্যাগি ছাড়া আর কিছু রান্না করতে পারে না।"

জিনিয়া বলল, "ভুল জানতেন। দেখুন না, আমাদেরও ধারণা ছিল মফস্সলের শাশুড়ি মানেই অশিক্ষিত হবে। তা তো না। আপনি মাস্টার্স করেছেন।"

উদ্দালকের মার মুখে হালকা হাসি এল, "তা করেছি। পড়াশোনা করতে ভালো লাগত। চাকরির পরীক্ষাও দিয়েছি। ওরা পার্টির লোককে নিল। বাবুর বাবা বা আমরা তো কোনও দিন ওসব পার্টি করিনি। তাই হল না। বরাবরই আমার পড়াশোনা ভালো লাগে।"

ঝাঁটা রেখে উদ্দালকের মা বললেন, “এসো রান্নাঘরে। চা খাই।”

জিনিয়া উদ্দালকের মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। উদ্দালকের মা বিভাবরী গ্যাস জ্বালিয়ে বললেন, “ওই টুলটায় বসো।”

জিনিয়া বসল। বিভাবরী বললেন, “চিনি খাও তো?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।”

বিভাবরী বললেন, “আমাদের ছেলে বরাবরই ইন্ট্রোভার্ট। কারও অসুবিধা হবে এমন কাজ কখনও করে না। একবার ওর বন্ধু ওর কতগুলো বই নিয়ে চলে গেল। দেয় আর না। সে বন্ধু এ বাড়িতে এসেছে। বাবুকে বললাম, বাবু বল তোর বইগুলো দিয়ে যাক। ছেলে বলে, থাক মা। এখন বললে লজ্জা পাবে। অন্যে লজ্জা পাবে সে নিয়েই ছেলে চিন্তায় পড়ে থাকে। এ ছেলের কী আর হবে। তা তোমাদের প্রেমটা কবছর ছিল?”

বিভাবরী হঠাৎ করে জিনিয়াকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন।

জিনিয়া একটু থতোমতো খেয়ে বলল, “প্রেম মানে?”

বিভাবরী বললেন, "তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল না? আমি জানি সব। আমাকে বলতে পারো।"

জিনিয়া একটু থমকে গিয়ে বলল, "তিন বছরের ছিল। আশীর্বাদও হয়ে গেছিল।"

বিভাবরী চা ছেঁকে তার দিকে কাপ এগিয়ে একটা টুলে বসে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, "বিয়ের পর বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন আসবে। বাবু তো যাবে না আমি জানি। পারলে এখনই ও স্কুলে চলে যায়। বাবুর ইচ্ছা আরও পড়াশোনা করতে আমেরিকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে যাবে। আমার অত চাহিদা নেই। ছেলে বাড়ির কাছে থাকলেই ভালো। তোমার অফিস কবে থেকে যেন?"

জিনিয়ার মুড অফ হয়ে গেছিল। চা খেতে ইচ্ছা করছিল না আর। তবু বিভাবরীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, "চার দিন পর।"

বিভাবরী বললেন, "লেডিজ স্পেশাল আছে। ওতেই যাবে। উলটোডাঙায় নেমে আবার অটো করতে হবে, তাই না?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।" বিভাবরী বললেন, "শাঁখা পলাগুলো খুলে রেখেছ?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।

বিভাবরী বললেন, “ঠিক আছে। ওসব আজকাল কেউ পরেও না। হাতে কিছু একটা পরে থেকো, তাহলেই হবে। আমাকে একটা কথা বলবে?”

জিনিয়া বলল, “বলুন।”

বিভাবরী বললেন, “বাবুকে বিয়ে করলে কেন তুমি? কী দেখলে ওর মধ্যে?”

জিনিয়া বিভাবরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি ঠিক বলতে পারব না। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ও আমার মধ্যে কী দেখল।”

বিভাবরী তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তাহলে কি আর তোমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম? সে আদর্শবাদী ছেলে। মেয়েদের কমোডিটি হিসেবে নাকি দেখা উচিত না। ঘরে ঘরে খাবার ধ্বংস করে শাড়ি পছন্দ অপছন্দ করার মতো মেয়ে পছন্দ করা যাবে না। কত ভারী ভারী কথা! নিজের ছেলেকে নিজেই চিনতে পারি না ভালো করে।”

জিনিয়া চুপ করে বসে রইল।

৩

বিকেল নাগাদ পৌঁছল তারা। গাড়ি থেকে নামতেই পল্টু একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে উদ্দালককে আর জিনিয়াকে প্রণাম করে বলল, "স্যার ঘর একদম পরিষ্কার করে রেখেছি। কোনও অসুবিধা হবে না।"

প্রণাম পেয়ে জিনিয়া খানিকটা ঘাবড়ে গেছিল। উদ্দালক হাসিমুখে বলল, "আরে এই তো পল্টু। ওর কথা বললাম না আপনাকে?"

জিনিয়া বলল, "ও হ্যাঁ।"

বাড়িওয়ালা সদাশিববাবু আর তাঁর স্ত্রী শোভনা গাড়ির শব্দ শুনে নেমে এসেছিলেন। জিনিয়াকে আদর করে গৃহপ্রবেশ করালেন।

উদ্দালক ঘরের অবস্থা দেখে খুশি হয়ে পল্টুকে বলল, "তুই এসব করেছিস?"

পল্টু বলল, "হ্যাঁ স্যার। বাবা বলল স্যার আসছেন বউদিকে নিয়ে, যা ভালো করে ঘর পরিষ্কার করে রাখ। বাবা মিষ্টিও পাঠিয়েছে।"

সদাশিববাবু বললেন, "আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ রান্না করতে হবে না।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। আজ তাহলে পল্টু পড়বি না?"

পল্টু মাথা চুলকে বলল, “কাল থেকে আসব স্যার?”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে।”

পল্টু খুশি হয়ে চলে গেল। সদাশিববাবুরা আরও কিছুক্ষণ বসে তারপর গেলেন।

ঘর ফাঁকা হলে উদ্দালক জিনিয়াকে বলল, “আপনি এই বেডরুমে শোবেন। আমি স্টাডিতে শোব। এসি লাগবে নাকি আপনার? তাহলে কিনে নেওয়া যাবে।”

জিনিয়া বলল, “এ ঘরে সৌপ্তিকের একটা ফটো লাগালে আপনি কি খুব রাগ করবেন?”

উদ্দালক বলল, “না না। রাগ করব কেন? এই ঘরটা আপনি ব্যবহার করবেন। তেমনই তো কথা হয়েছিল। কোনও সমস্যা নেই।”

জিনিয়া বলল, “এ বাড়ির ভাড়া কত? আমি যদি অর্ধেক টাকা দিই, তাহলে আপত্তি আছে?”

উদ্দালক বলল, “নো আপত্তি। মিষ্টি খাবেন? এখানকার মালাই চমচম বিখ্যাত। পল্টু নিশ্চয়ই সেই মিষ্টিই এনেছে। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।”

উদ্দালক মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে এল। জিনিয়া সেখান থেকে একটা মিষ্টি তুলে খেয়ে বলল, "সত্যি ভালো খেতে।"

উদ্দালক একসঙ্গে দুটো মুখে চালান করে দিয়ে বলল, "এখানে সব পিওর জিনিস। কোনও ভেজালের ব্যাপার নেই। এ কারণেই এখনও পড়ে আছি এখানে। শেষমেশ হয়তো কোথাও যাওয়াও হবে না। দেখা যাক কী হয়।"

জিনিয়া বলল, "আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি।"

উদ্দালক হাত ধুয়ে নিয়ে বলল, "কী?"

জিনিয়া বলল, "আপনার মা সৌপ্তিকের ব্যাপারে সবই জানেন। এ ব্যাপারে আমাকে বেশ কয়েকবার হিন্টও দিয়েছেন।"

উদ্দালক বলল, "ধুস, ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করবেন না। কে কী বলল, সেসব নিয়ে ভাবলে আমাদের এগ্রিমেন্টটা ওয়ার্ক আউট করবে না। আপনি আপনার জগৎ নিয়ে থাকবেন, আমি আমার জগৎ নিয়ে। কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করব না। মনে করুন আমরা একটা হোস্টেলে আছি। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাব না। সিম্পল। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি দেখছি বেরিয়ে চপ শিঙাড়া কিছু পাওয়া যায় নাকি।"

উদ্দালক বেরিয়ে গেল। জিনিয়া ব্যাগ থেকে সৌপ্তিকের ফটো বের করে দেওয়ালে টাঙিয়ে সৌপ্তিকের হাসিমুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে নিল। খানিকটা কৌতূহল হতে উদ্দালকের স্টাডিরুমে ঢুকল। ঘরভর্তি শুধু বই আর বই। একটা ছোট্ট তক্তপোশ এক কোণে। বালিশও আছে তাতে।

জিনিয়া বইগুলো নেড়েঘেঁটে দেখতে দেখতেই উদ্দালক চলে এল, "বেগুনি পেয়ে গেলাম, খেয়ে নেবেন।"

জিনিয়া বলল, "আপনি এই ছোট্ট তক্তপোশে শুতে পারবেন?"

উদ্দালক বলল, "এখানেই তো ম্যাক্সিমাম দিন শুয়ে পড়ি। পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসে। সব যে পড়ার বই, তা না। এই যেমন আপনার হাতে আছে ব্রজদার গুল্প সমগ্র। রূপদর্শী, মানে গৌরকিশোর ঘোষের লেখা। ছোট্ট বই, কিন্তু ইমপ্যাক্ট অ্যাটম বোমার সমান।"

জিনিয়া বইটা রেখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ। এরকম এগ্রিমেন্ট না থাকলে আমি সত্যি সমস্যায় পড়তাম।"

উদ্দালক হেসে বলল, “ধুস, যা হয়েছে দু পক্ষের ভালোর জন্যই হয়েছে। নিন নিন, বেগুনিটা ঠান্ডা হলে এক্কেবারে ভালো লাগবে না।“

৪

সদাশিববাবুর স্ত্রী রুটি, বেগুনভাজা, ডাল, মাংস করেছিলেন। তারা খেয়ে এলে জিনিয়া বেডরুমে গেল। উদ্দালক স্টাডিরুমে।

রাত এগারোটা।

উদ্দালক স্টাডিরুমে পড়ছিল। জিনিয়া এসে বলল, “একটু বসতে পারি এখানে? কী সব শব্দ আসছে। ভয় লাগছে।”

উদ্দালক হাসল, “শেয়াল ডাকার শব্দ। কলকাতা থেকে এলে একটু ভয় লাগাটা স্বাভাবিক। বসুন।”

জিনিয়া বসল। উদ্দালক বলল, “আপনি তো নিশাচর প্রাণী। বই পড়তে পারেন। ‘মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস’ পড়েছেন?”

জিনিয়া মাথা নাড়ল।

উদ্দালক বলল, "আপনার পেছনের তাকের থার্ড র‍্যাকের সেকেন্ড বই। পড়ে দেখুন। ভারী ইন্টারেস্টিং।"

জিনিয়া বলল, "আপনার মুখস্থ থাকে?"

উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। নিজেই গুছিয়ে রাখি। মনে থাকে কোথায় কী রাখি। পড়ে দেখুন।"

জিনিয়া উঠল না। বলল, "আমার ইচ্ছে করছে না পড়তে। সৌপ্তিকের কথা মনে পড়ে রোজ এই সময়টা। আর কোনও কিছু করতেই ইচ্ছা করে না।"

উদ্দালক বলল, "আচ্ছা। তাহলে বসে থাকবেন?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

উদ্দালক বলল, "বেশ।"

সে বই পড়ায় মন দিল।

জিনিয়া বলল, "আপনি এগ্রিমেন্টটা এইজন্যই করেছেন যে আপনি নিজের জগতে থাকতে পারবেন, মানে এরকম বই পড়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান?"

উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। বিয়ে মানেই অনেক হ্যাপা। আমি নিতে পারতাম না।"

জিনিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। উদ্দালক একটা নোটপ্যাড নিয়ে বই থেকে নোট নেওয়া শুরু করল।

জিনিয়া উঠে ঘর থেকে বেরোল। উদ্দালক সেটা লক্ষ করল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘণ্টাখানেক বাদে জিনিয়া এসে বলল, "আমাকে একদিন সৌপ্তিকদের বাড়ি নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কবে যাব?"

উদ্দালক বলল, "কালকেই যেতে পারি। আমার স্কুল কাল ছুটি আছে। কাল চলুন। কোনও অসুবিধে নেই।"

জিনিয়া বলল, "পরশু থেকে আমারও অফিস আছে। কী করে যাতায়াত করব?"

উদ্দালক বলল, "আমি একটা টোটো দেখে রাখব। স্টেশনে দিয়ে আসবে। তারপর পারবেন তো?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল। উদ্দালক বই রেখে বলল, "আমি এবার ঘুমিয়ে পড়ব। আপনি কি এখানেই বসে থাকবেন?"

জিনিয়া বলল, "না, ঠিক আছে। আমি ও ঘরে যাচ্ছি।"

উদ্দালক বলল, "এখানে কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই। দরজা জানলা খুলে শুলেও কেউ আসবে না। নিরুপদ্রব জায়গা। নিশ্চিন্তে থাকুন।"

উদ্দালক তক্তপোশে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

জিনিয়া উঠে বেডরুমে গিয়ে ছিটকিনি দিল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। সৌপ্তিকের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ ধরে। খাটে শুয়ে ছটফট করল কিছুক্ষণ। জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তাঘাট শুনশান। বাড়ির বাইরে রাস্তায় স্ট্রিটলাইট জ্বলছে। তাদের পাড়ার কুকুরটার মতো একটা কুকুর শুয়ে আছে রাস্তার উপরে।

বেডরুমে একটা টিভি আছে। জিনিয়া টিভি চালাল কম ভলিউমে। কিছুক্ষণ দেখে বন্ধ করে দিল। টিভির নিচে একটা ডায়েরি রাখা। ডায়েরিটা খুলে দেখল একটা হিসেব করেছে উদ্দালক, হিসেবটা এক বছর আগের। এরকম লেখা—

১২-৩-২০১৯

পল্টুদের দোকান থেকে আনা হয়েছে

১ কিলো চাউল, না না চাউল না, চাল

৫০০ গ্রাম মুগ ডাল।

১ কিলো আলু।

১ কিলো পেঁয়াজ।

হলুদের প্যাকেট।

পোস্তর প্যাকেট।

এক প্যাকেট সিগারেট (সিগারেট ছেড়ে দিতে হবে। সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়)

তারপরের দিন আর কোনও হিসেব লেখা নেই। পরপর কয়েকটা লাইন লেখা

বৃষ্টি হবে

আকাশ পাতাল

বৃষ্টি ভেজা

শুকনো বাতাস।

আমের পরশ পাতায় পাতায়...

(আমের পরশ পাতায় পাতায়? ধুস, আমার দ্বারা কবিতা হবে না)

তার পরের পাতায় উদ্দালক লিখেছে—

ক্লাস সেভেন বি-তে পড়াতে হবে। জীবনে আমার একটাই দুঃস্বপ্ন ছিল। সেভেন বি। সে স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। এরপর আমি একে একে সব ক্লাসের বি বা সি সেকশন পড়াব। কোনও ছাত্র আমার কথা শুনবে না। হেডস্যার আমায় বকা দেবেন। জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠবে। ঠিক আছে। এই ডায়েরিতে আর কিছু লিখব না। এলোমেলো লেখা হয়ে যাচ্ছে।

এরপরে ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই। জিনিয়ার কৌতূহল হল। উদ্দালকের আর কোনও ডায়েরি আছে? ঘরে কোনও ডায়েরি দেখতে পেল না সে।

৫

সৌপ্তিকদের বাড়ির তালা খুলে জিনিয়া বলল, “কদিন এলাম না। নোংরা হয়ে গেছে।”

উদ্দালক বলল, “বাগানটা কিন্তু ভারী সুন্দর। অযত্নে গাছগুলো মরে যাচ্ছে। আগাছাও হয়েছে। এখানে কিছু গাছ লাগানো যেতে পারে।”

জিনিয়া ঝাঁটা বের করে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।

উদ্দালক ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। জিনিয়া একটা ঘর দেখিয়ে বলল, “এটা সৌপ্তিকের ঘর। খাটের ওপর অ্যালবাম রাখা আছে। দেখুন।”

উদ্দালক সৌপ্তিকের ঘরে ঢুকল।

ঘরে সৌপ্তিকের একটা বাঁধানো ছবি রাখা। সে একটা ন্যাকড়া জোগাড় করে ছবিটা মুছে দিল। জিনিয়া সেটা দেখে কিছু বলল না। বলল, “লাঞ্চে কী খাবেন? রান্না করব?”

উদ্দালক বলল, “কী দরকার আছে? খাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে। আমি বই নিয়ে এসেছি। পড়ছি, আপনি সময় নিন।”

জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে।”

উদ্দালক ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে বই পড়তে শুরু করল।

জিনিয়ার ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছিল। সে সৌপ্তিকের অ্যালবাম দেখতে বসল।

উদ্দালকের ফোন বাজছিল। দেখল মা ফোন করছে। ধরল, "বলো।"

মা বলল, "কী খবর তোর? কী করছিস?"

উদ্দালক বলল, "কলকাতা এসেছি।"

মা বলল, "কী করতে?"

উদ্দালক বলল, "ওর অফিসের কিছু কাজ ছিল। সেগুলো মিটিয়ে নিয়ে ফিরব।"

মা বলল, "হুঁ। সংসার কিছু করছিস, না আগের মতোই করে যাচ্ছিস?"

উদ্দালক বলল, "কেন সংসার করব না? বিয়ে দিয়েছ তো সংসার করার জন্যই। দারুণ সংসার করছি।"

মা বলল, "আমি দেখতে যাব?"

উদ্দালক বলল, "কেন আসবে না? অবশ্যই আসবে। তুমি আসতে চেয়েছ আর আমি আটকেছি, কোনও দিন হয়েছে?"

মা বলল, "দেখ বাবু, আমি তোর কিছুই বুঝতে পারিনি। তুই আমার ছেলে, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তুই অনেক দূরের কেউ। তুই এই মেয়েকে নিয়ে সুখে থাকতে পারবি?"

উদ্দালক বলল, "না পারার তো কোনও কারণ নেই।"

মা বলল, "তোকে ওর আগের প্রেমিকটার কথা কিছু বলেছে?"

উদ্দালক আড়চোখে দেখল জিনিয়া মন দিয়ে সৌপ্তিকের অ্যালবাম ঝাড়পোঁছ করছে। সে বলল, "হ্যাঁ, সব তো বলেনি। বলেছে কিছুটা। এরকম অনেকেরই থাকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মা বলল, "আমি মাথা ঘামাব না তো কে ঘামাবে? আমাকেই তো মাথা ঘামাতে হবে! অদ্ভুত জেদ করে বিয়েটা করলি জোর করে। সব কথা আমাকে খুলেও বলিস না। তুই কি আমাকে শত্রু মনে করিস?"

উদ্দালক বলল, “তা না মা। এখানে শত্রু মিত্রর কোনও ব্যাপার নেই। অহেতুক রিঅ্যাক্ট করছ তুমি।”

মা বলল, “জিনিয়ার বাবা বলছিলেন দুই ফ্যামিলি একসঙ্গে কোথাও একটা ঘুরতে গেলে ভালো হয়। যাবি?”

উদ্দালক বলল, “আমার তো স্কুল আছে। তোমরা ঘুরে এসো।”

মা ধমক দিল, “যখনই কোনও কাজের কথা বলি, তুই স্কুল দেখিয়ে দিস। গরমের ছুটিতে তো যেতে পারবি। যাবি কি না বল, তাহলে টিকেট কাটতে দেব।”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে, আমি দেখি ওর অফিস ছুটি পাবে নাকি, তাহলে জানাব।”

মা গজগজ করতে লাগল, “আর-এক নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে। আমরা কিছু ঠিকও করতে পারব না?”

উদ্দালক বলল, “কেন করতে পারবে না? আমি কি না বলে দিয়েছি? আমি বললাম কথা বলে জানাব। রাগ করছ কেন? প্রেশারের ওষুধ খেয়েছ?”

মা বলল, “খেয়েছি। তোর চিন্তায় আমার ঘুম হয় না ভালো করে। প্রেশার সুগার সব বেড়ে যাবে।”

উদ্দালক বলল, “চিন্তা করার কিছু নেই মা। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, চাকরি করছি, খাচ্ছি ঠিকঠাক। কত লোক আছে খেতেই পায় না ঠিক করে। চাকরি পর্যন্ত পেতে তাদের কত কষ্ট। তাদের থেকে তো ভালো আছি। অকারণ চিন্তা কোরো না। নিজের খেয়াল রাখো। রাখি?”

ফোন রেখে উদ্দালক শ্বাস ছেড়ে বই পড়তে শুরু করল। জিনিয়া বলল, “আমি এই অ্যালবামটা নিয়ে যাব।”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। ওঁরা কিছু মনে করবেন না তো? ওঁদের বলে নেবেন।”

জিনিয়া একটু থমকে বলল, “তা ঠিক, না বলে নেওয়া যাবে না।”

উদ্দালক সোফার ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সকাল সকাল ট্রেনে করে কলকাতা আসার ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে গেছিল তার।

জিনিয়া বলল, “আপনি খাটে শুতে পারেন।”

উদ্দালক বলল, "না ঠিক আছে। আপনার হয়ে গেলে ডাকবেন। আমি একটু ঘুমাই।"

শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্দালক ঘুমিয়ে পড়ল।

৬

শেয়ালদা স্টেশন থেকে তারা ট্রেনে উঠল বিকেল নাগাদ। অফিস টাইমের ভিড়। জিনিয়াকে বসিয়ে তার সামনে বসে উদ্দালক বলল, "ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবেন?"

জিনিয়া বলল, "পারব। পারতে হবে। না পারলে হবে না, চাকরি ছাড়তে পারব না।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। প্রথমদিকে নাহয় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

জিনিয়া বলল, "না না পারব।"

উদ্দালক আর কিছু বলল না।

সন্ধে সাতটা নাগাদ তারা ট্রেন থেকে নামল। অটো নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল পল্টু দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দালক জিভ কাটল, "দেখলেন, পল্টু আসবে ভুলেই গেছিলাম।"

দরজা খুলল উদ্দালক। পল্টু বলল, “স্যার, কাল স্কুলে যাবেন তো?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ। কেন রে?”

পল্টু বলল, “মিষ্টি নিয়ে যাবেন স্যার। সব স্যাররা বলছিল আপনি এলেই খাওয়াতে বলবে। আপনি আগে থেকেই মিষ্টি নিয়ে যাবেন।”

উদ্দালক জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল, “এখানকার নিয়ম এটাই। রিটায়ারমেন্ট থেকে বিয়ে, সবেতেই খাওয়াতে হয়। এদিকে দেখুন এখানে সবাইকেই বিয়েতে বলেছিলাম, কেউ গেলেন না। জানে অত দূরে গিয়ে কী হবে, সেই তো স্কুলে খাওয়াদাওয়া হবে।”

জিনিয়া হাসল। উদ্দালক পল্টুকে বলল, “যা স্টাডিতে গিয়ে অঙ্কগুলো করতে শুরু কর। আমি আসছি।”

পল্টু স্টাডিরুমে গিয়ে বসল।

উদ্দালক ফ্রেশ হয়ে পড়াতে বসল। জিনিয়া কিছুক্ষণ টিভি দেখল। তার খিদে পাচ্ছিল। সেই দুপুরের পরে আর খাওয়াও হয়নি।

উদ্দালক ঘর নক করল। জিনিয়া খুলে দেখল উদ্দালকের হাতে রোল। উদ্দালক বলল, "এখানকার রোল। কলকাতার মতো লাচ্চা পরোটার রোল না, তবে খেতে ভালো। আপাতত এই খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করুন, পল্টু দেশি মুরগি নিয়ে আসছে, রাতে রুটি দিয়ে সেই খাওয়া যাবে। আপনি দেশি মুরগির ঝোল খান তো?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘরে ছাত্র শিক্ষকের চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হল। পল্টু মাংস ধুয়ে নিল। উদ্দালক একটা বারমুডা আর গামছা পরে রান্না শুরু করল। জিনিয়া বলল, "আমি কিছু করে দেব?"

উদ্দালক বলল, "আপনি? না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমরাই করে নিচ্ছি।"

পল্টু গম্ভীর গলায় বলল, "স্যার, বউদি আটা মেখে দিতে পারবেন?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ পারব। দাও।"

উদ্দালক বলল, "না না, কী দরকার, আমরা করে নিচ্ছি।"

জিনিয়া বলল, "না ঠিক আছে। আমি রুটি করতে পারি। কটা রুটি করতে হবে?"

উদ্দালক বলল, "আপনি কটা খাবেন?"

জিনিয়া বলল, "তিনটে।"

উদ্দালক বলল, "আমিও তিনটে। আর পল্টুর জন্য বারোটা। মানে আঠেরোটা রুটি করতে হবে।"

জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "পল্টু বারোটা খেতে পারবে?"

উদ্দালক হাসল, "ও হল বাংলার দামাল ছেলে। এই সাঁতার কাটছে, এই দৌড়োচ্ছে, সারাক্ষণ ওর খিদে পায়। আপনার অসুবিধে হলে থাক। আমি রুটি করে দিচ্ছি।"

জিনিয়া বলল, "না না, আমি করে নেব। কোনও অসুবিধা নেই। করছি।"

তিনজনে মিলে দেড় ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে গেল। বেশিরভাগ মাংস পল্টুই খেল। খাওয়ার পর পল্টু বলল, "স্যার রসগোল্লা নিয়ে আসব? এরকম সুন্দর রান্নার পর রসগোল্লা ভালো লাগবে।"

উদ্দালক বলল, “থাক। তোকে আর বেরোতে হবে না। আমি সাইকেল নিয়ে গিয়ে নিয়ে আসছি। তুই বউদির কাছে বস।”

উদ্দালক বেরিয়ে গেল।

পল্টু বলল, “বউদি আপনি জামরুল খাবেন? আমাদের বাড়িতে দারুণ জামরুল হয়।”

জিনিয়া হাসল, “ঠিক আছে। নিয়ে এসো।”

পল্টু উৎসাহ পেয়ে বলল, “আমি ভালো গাছও বাইতে পারি। ডাব হলে পেড়ে নিয়ে আসব।”

জিনিয়া বলল, “তুমি এইটুকু বয়সে এত সব কিছু পারো?”

পল্টু দাঁত বের করল, “হ্যাঁ বউদি। সব পারি। স্যার পারেন না। আমি একদিন স্যারকে বললাম স্যার চলুন নারকেল গাছ বাই, বললেন ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। নারকেল গাছ বাওয়া কী এমন কঠিন বলুন?”

জিনিয়া বলল, “সেটা তো আমিও জানি না। আমিও কোনও দিন নারকেল গাছ বাইনি।”

পল্টু হাত-টাত নাড়িয়ে গাছ বাওয়া নিয়ে জ্ঞান দিতে শুরু করল। জিনিয়ার শুনতে মজা লাগছিল। এই কৈশোরের স্বাদ তারা পায়নি। কংক্রিটের জঙ্গলে আর মোবাইলের যুগে এখনও এই কৈশোর বেঁচে আছে, এটাও কম নয়।

উদ্দালক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। বলল, "রসগোল্লার সঙ্গে পান্তুয়াও নিয়ে এসেছি। এখানকার বিখ্যাত। আর আপনার জন্য টোটো বলে এলাম। কাল সাড়ে সাতটার সময় চলে আসবে। আটটা দশের লেডিস স্পেশাল পেয়ে যাবেন।"

পল্টু রসগোল্লা মুখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আচ্ছা স্যার, বউকে কি কেউ আপনি করে কথা বলে?"

জিনিয়া হাঁ হয়ে গেল। উদ্দালক হো হো করে হেসে উঠল।

৭

অগ্নি টিভি দেখছিলেন। মালতী এসে বসলেন, "মেয়েটার জন্য চিন্তা হয় খুব।"

অগ্নি বললেন, "কেন? বিয়ে বিয়ে করে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছিলে তো। এখন চিন্তা হচ্ছে কেন?"

মালতী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “তিন্নিকে তোমার আমার থেকে কি কেউ বেশি চেনে? ছোটো থেকেই মারাত্মক জেদি মেয়ে। যেটা ঠিক করে, সেটাই করে এসেছে বরাবর। সে মেয়ে হঠাৎ করে নিজে থেকেই বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেল, সংসার করতে চলে গেল, আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।”

অগ্নি বললেন, “তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে বিশ্বাস করো। এতদিন আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে। আমি বলেছিলাম, ওকে কিছুদিন সময় দাও। দিলে না। এখন যখন ও বিয়ে করেও নিল, তখনও তোমার অসুবিধা হচ্ছে। শোনো, উদ্দালক ছেলেটাকে তো আমি দেখেছি। খুবই ভদ্র এবং ভালো ছেলে। সময় দাও। মিটে যাবে সব কিছু।”

মালতী বললেন, “তুমি তিন্নিকে চেনো না? মিটে যাবে বলে তোমার মনে হয়?”

অগ্নি বললেন, “তাহলে মেয়ের বিয়ে দিলে কেন?।”

মালতী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “আমার কিছু ভালো লাগছে না।”

অগ্নি বললেন, “প্রবলেম ক্রিয়েট করতে তোমার কোনও জুড়ি নেই, জানো তো?”

মালতী বলল, "তাহলে কী করতাম? সৌপ্তিকের ছবি নিয়ে বসে থাকছে, মাঝরাতে বিয়ের বেনারসি, গয়না পরে বসে থাকছে, আমি একা কত প্রেশার নেব? পারা যায়?"

অগ্নি বললেন, "নিতে হবে না। প্রেশার নিয়ো না। অসংখ্য ফ্যামিলি ভালোবাসাহীনতাতেই টিকে রয়েছে চিরকাল। আর যদি না টিকতে পারে, ডিভোর্স করে নেবে। ও সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে। ওর কোনও অসুবিধা হবে না।"

মালতী আর্তনাদের মতো শব্দ করে বললেন, "এ কথা তুমি বলতে পারলে? শেষে ডিভোর্স? সমাজে কোনও মান সম্মান থাকবে আর?"

অগ্নি বললেন, "না থাকার কী আছে? ডিভোর্স কী এমন হাতি ঘোড়া ব্যাপার? এতে মান সম্মান যাবে কেন? কম্প্যাটিবল হয়নি একটা সম্পর্ক, ভেঙে গেছে। যেতেই পারে। নো বিগ ডিল।"

মালতী বললেন, "তুমি সব কিছু এত ছোটো করে দ্যাখো কেন? এতগুলো টাকা খরচ করে বিয়েটা হল, এত এত লোক খেয়ে গেল, তারা যখন জানবে বিয়েটা ডিভোর্স হয়ে গেছে, তখন ভালো লাগবে?"

অগ্নি হেসে ফেললেন, "তোমাকে এত কে ভাবতে বলেছে বলো তো? এই রদ্দি সিরিয়ালগুলো আছে, সেগুলো দেখে সময় কাটাও না। বেশি ভেবে ফ্যালো, বেশি রিঅ্যাক্ট

করে ফ্যালো। এগুলো ধীরে ধীরে কমিয়ে ফ্যালো বরং। নির্লিপ্ত থাকো। মেয়েটা বড়ো হয়েছে, ওর লাইফের ডিসিশন ওকেই নিতে দাও। সব কিছুতে নাক গলাতে যেয়ো না। থাকুক ওরা ওদের মতো। যা হবে দেখা যাবে।”

মালতী বললেন, “আমি পারি না। আমার চিন্তা হয়।”

অগ্নি বললেন, “পারতে হবে। শরীরে, মনে নির্লিপ্ততা আনতে হবে। ভাবো তো, সৌপ্তিকের খবরটা পাওয়ার পরে তিন্নি ঠিক কীসের মধ্যে দিয়ে গেছিল? ওকেও তো বুঝতে হবে! গোটা সমাজের লোক কী ভাববে বুঝতে পারছ, মেয়ের ডিভোর্স হলে তারা কী বলবে সেটা বুঝতে পারছ, আর নিজের মেয়ের কষ্টটা বুঝতে পারছ না, তাহলে কী করে হবে?”

মালতী কেঁদে ফেললেন, “আমি কি এতটাই খারাপ?”

অগ্নি বললেন, “খারাপ তো কেউ বলেনি তোমাকে! একবারও বলিনি তুমি খারাপ। আমি শুধু বলতে চাইছি তুমি এবার তিন্নির থেকে বেরিয়ে এসো। ঠাকুরের শরণাপন্ন হও। তাও যদি না পারো, তাহলে বই পড়ো, সিনেমা দ্যাখো। বাজার-টাজার করো। মোদ্দা কথা, তিন্নিকে রেহাই দাও। ও তো ওর কোনও সমস্যা তোমার কাছে এসে ডিসকাস করে না। তুমি কেন অকারণ ওর সমস্যার মধ্যে ঢুকতে চাইছ? মেয়ে বড়ো হয়েছে। বোঝো, বুঝতে চেষ্টা করো।”

মালতী থমথমে মুখে বসে রইলেন।

৮

ঘেমে নেয়ে অফিসে পৌঁছল জিনিয়া। সুলগ্না দেখে বলল, "কি রে, এই অবস্থা কেন?"

জিনিয়া বলল, "এখন রোজই এই অবস্থা হতে চলেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করব।"

সুলগ্না বলল, "ওহ, সে তো ভুলেই গেছিলাম। তারপর কেমন কাটছে ম্যারেড লাইফ? শাঁখা, সিঁদুর কোথায়?"

জিনিয়া বলল, "ওসব পরে কী হবে? সত্যিকারের তো আর বিয়ে করিনি। কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজে আবার ওসব পরে নাকি?"

সুলগ্না বলল, "তাও ঠিক। আচ্ছা বসের সঙ্গে দেখা করে আয়। খোঁজ করছিলেন।"

সুপ্রতিম চেম্বারে কাজ করছিলেন। জিনিয়া নক করে প্রবেশ করল। সুপ্রতিম বলল, "কেমন কাটছে ম্যারেড লাইফ জিনিয়া?"

জিনিয়া হাসল, "ভালো স্যার।"

সুপ্রতিম বললেন, “তুমি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে এখন?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ স্যার।”

সুপ্রতিম বললেন, “পারবে তো?”

জিনিয়া বলল, “প্রথম কদিন অসুবিধা হবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।”

সুপ্রতিম বললেন, “হ্যাঁ তা হবে। তোমার অফিস ভেহিকেল লাগলে নিয়ে নেবে। ওকে?”

জিনিয়া বলল, “থ্যাংকিউ স্যার।”

ডেস্কে এসে বসে জিনিয়া দেখল উদ্দালক ফোন করছে। ধরল সে, “হ্যাঁ, আমি পৌঁছেছি।”

উদ্দালক বলল, “ফেরার সময় ট্রেনে উঠতে পারবেন তো?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ, পারব। অসুবিধা হবে না।”

উদ্দালক বলল, “ওকে। আমি স্কুলে বেরোলাম। বাই।”

ফোনটা রেখে জিনিয়া কম্পিউটার অন করল। সুলগ্না এসে বলল, “আচ্ছা জিনিয়া, আমাকে একটা কথা বলবি?”

জিনিয়া বলল, “কী?”

সুলগ্না তার দিকে তাকিয়ে বলল, “সিরিয়াসলি নো ফিজিক্যাল রিলেশন? আই মিন, তোর বর তো বেশ হ্যান্ডু রে, তোর ইচ্ছা করেনি?”

জিনিয়া কঠিন মুখে বলল, “আমার বর বলে কিছু নেই। তুই জানিস ব্যাপারটা কী। বারবার এভাবে মেনশন করলে ভালো লাগবে না আমার।”

সুলগ্না বলল, “ওকে, ওকে। এক্সট্রিমলি সরি। জাস্ট এক লাইনে বল, ঠিক কী হচ্ছে তোদের দুজনের মধ্যে?”

জিনিয়া বলল, “কিছুই হচ্ছে না। আমরা দুজন আলাদা দুটো ঘরে থাকি জাস্ট লাইক হোস্টেল। সিম্পল। অ্যান্ড ডেফিনিটলি হি ইজ এ জেন্টলম্যান। ভীষণ ভদ্রলোক। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।”

সুলগ্না মুখ চুন করে বলল, "এই হয় তো, যারা সত্যিকারের ভালো ছেলে, তারা এরকম উলটোপালটা বিয়ে করে দিন কাটিয়ে দেয়।"

জিনিয়া বলল, "মানে?"

সুলগ্না বলল, "মানে আবার কী? ভালো ছেলেগুলো আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না, কিছু প্লেবয় পড়ে থাকে, আর কিছু ঠরকি বুড়ো। নইলে দেখ, তোর তো বিয়ের দরকার ছিল না, কিন্তু ভালো ছেলে পেয়ে গেলি। দিস ইজ কলড সৌভাগ্যবতী মেয়ে।"

জিনিয়া বলল, "এরকম ব্যাপার? উদ্দালকের সঙ্গে কথা বলব? ওকে বিয়ে করবি?"

সুলগ্না বলল, "থাক ভাই। মিছে আশা দেখাস না আর। কষ্ট হয়। তবে তুই যা ডেসক্রিপশন দিচ্ছিস, সে অনুযায়ী এ ছেলে একদিকে ভদ্র, অন্যদিকে কোল্ড হার্টেড। এসব ছেলের থেকে দূরে থাকাই ভালো। এরা কাউকে ভালোবাসতে পারে না।"

জিনিয়া বলল, "ভালোবাসাটা চাইনি বলেই তো এই বিয়েটা করেছি সুলগ্না। দেখা যাক, সব কিছু কোন দিকে যায়। ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমার এখন অবধি কোনও অভিযোগ নেই।"

সুলগ্না বলল, "আচ্ছা? প্রেমে পড়ে যাচ্ছিস না তো আবার?"

জিনিয়া ছিটকে গেল খানিকটা। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সুলগ্না বলল, “কী হল?”

জিনিয়া কড়া গলায় বলল, “আমার সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি না মারলেই খুশি হব। প্লিজ।”

সুলগ্না জিনিয়ার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বলল, “সরি ইয়ার। এক্সট্রিমলি সরি। আমি অত ভেবে কিছু বলিনি।”

জিনিয়া বলল, “ওকে। নাও, জাস্ট লিভ মি অ্যালোন।”

সুলগ্না বলল, “রেগে গেলি?”

জিনিয়া বলল, “না, ঠিক আছে। প্লিজ এখন যা। ভালো লাগছে না।”

সুলগ্না বলল, “এক্সট্রিমলি সরি। আবার সরি বলছি। প্লিজ রেগে থাকিস না।”

জিনিয়া চুপ করে রইল।

সুলগ্না নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। জিনিয়া কিছুক্ষণ কাজ করে ওয়াশরুমে গিয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেলল।

কিছুক্ষণ কেঁদে সুপ্রতিমের চেম্বারে গিয়ে বলল, "স্যার এখন একটু বেরোতে হচ্ছে। দরকার পড়েছে হঠাৎ একটা।"

সুপ্রতিম বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। গাড়ি লাগবে?"

জিনিয়া বলল, "না স্যার।"

সুপ্রতিম বললেন, "ঠিক আছে। সাবধানে যাও।"

জিনিয়া আর দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল।

ট্যাক্সি নিয়ে সৌপ্তিকদের বাড়ি পৌঁছল। দরজা খুলে সৌপ্তিকের ঘরে গিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

৯

স্কুলে ঢুকেই সুদেববাবুর তোম্বা মুখটা দেখল উদ্দালক। সে হেসে বলল, "সব ঠিক তো স্যার?"

সুদেববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "হুম।"

টিচার্সরুমে যেতে সবাই হইহই করে উঠলেন। তারাপদবাবু বললেন, "হালকায় ছেড়ে দেব না কিন্তু বাপু। বিয়ের মেনুটাই স্কুলে করতে হবে। শুধু মিষ্টিতে হবে না।"

উদ্দালক বলল, "আচ্ছা বেশ। আপনাদের এই প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম।"

বিরাট একটা গিফট প্যাকেট তার জন্য রাখা হয়েছিল। উদ্দালককে সব শিক্ষক মিলে সেটা দিলেন। হেডস্যার বললেন, "অদ্ভুত ছেলে তো বাপু তুমি? এই কদিন ছুটিতেই হয়ে গেল? কোথাও বেড়াতে গেলে না?"

উদ্দালক হাসল, "হ্যাঁ স্যার, মানে যাব, আপনাকে বলা হয়নি, যাব।"

হেডস্যার বললেন, "ঠিক আছে। ছুটিছাটা লাগলে আমাকে বলবে।"

সারাদিনই ক্লাস ছিল। স্কুল থেকে বেরিয়ে উদ্দালক সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছে এমন সময় দেখল জিনিয়ার মা ফোন করছেন, উদ্দালক ধরল, "হ্যাঁ বলুন।"

মালতী বললেন, "বলছি জিনিয়াকে ফোনে পাচ্ছি না বাবা। ও কি ফিরেছে?"

উদ্দালক থমকে গিয়ে বলল, “অফিসে ফোন করেছিলেন?”

মালতী বললেন, “ওর বন্ধু আছে সুলগ্না বলে একজন। সে বলল ফার্স্ট হাফেই বেরিয়ে গেছে। ফোনও পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি না ঠিক, কী হল।”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। আপনি রাখুন, আমি দেখছি।”

ফোন রেখে উদ্দালক জিনিয়ার ফোনে চেষ্টা করল। ফোন নট রিচেবল বলছে।

সাইকেল নিয়ে সে সোজা স্টেশনে চলে গেল।

কপাল ভালো ট্রেন এসে গেছিল। টিকেট কাটার সময় পেল না। মাথাতেও আসেনি টিকেট কাটার কথা। সৌভাগ্যবশত রাস্তায় বা শিয়ালদা স্টেশনে তার চেকিং হল না। শিয়ালদায় নেমে ট্যাক্সি করে সে যখন সৌপ্তিকদের বাড়ি পৌঁছল, তখন রাত সাড়ে আটটা বাজে। দেখল আলো জ্বলছে।

খানিকটা ইতস্তত করে কলিং বেল বাজাল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় জিনিয়া এল।

উদ্দালক বলল, “বাড়িতে ফোন করেননি, আপনার বাড়ির লোক চিন্তা করছে তো।”

জিনিয়া গেট খুলে তার কথার উত্তর না দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

উদ্দালক বাড়িটায় ঢুকে সৌপ্তিকের ঘরে গেল। বিছানা এলোমেলো। সৌপ্তিকের ছবি নামিয়ে খাটে রাখা। বোঝা যাচ্ছে ওর ছবি জড়িয়ে ধরে জিনিয়া শুয়ে ছিল।

উদ্দালক বলল, "রাতে যিনি থাকেন, কখন আসবেন?"

জিনিয়া বলল, "জানি না। আপনি কেন আসতে গেলেন? আমি খবর পাঠিয়ে দিতাম।"

উদ্দালক বলল, "আপনার মা চিন্তা করছিলেন। আমার কেন জানি না মনে হল আপনি এখানেই আছেন। তাই চলে এলাম।"

জিনিয়া বলল, "আপনার খুব দায়, না?"

উদ্দালক বলল, "কীসের দায়?"

জিনিয়া বলল, "ভালো থাকার? সবার কাছে ভালো সেজে বেড়ান, খুব দায় আপনার, না?"

উদ্দালক রাগল না। বলল, "নাহ। আমার সেসব দায় নেই। দায়িত্ব আছে বলতে পারেন। এই যেমন এখানে আপনি একা আটকে গেলে কোথায় যাবেন, সেটা নিয়ে ভাবলাম একবার। একই বাড়িতে থাকি আমরা। একটা হোস্টেলে থাকলেও তো রুমমেটের জন্য চিন্তা হয়। ব্যাপারটা সেরকমই।"

জিনিয়া বলল, "আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব।"

উদ্দালক বলল, "সে থাকুন। এখান থেকে আপনার অফিসে যেতেও সুবিধা হবে। তবে যাঁদের বাড়ি, তাঁদের পারমিশন নিতে হবে। এই বাড়িতে আর-একজন রাতে থাকতে আসবেন। তিনি লোক হিসেবে কেমন, তাও জানেন না। ব্যাপারগুলো মিটিয়ে থাকতে চেষ্টা করুন বরং। তাহলে সুবিধা হবে।"

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উদ্দালক সৌপ্তিকের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চুপ করে বসল। কিছুক্ষণ পর জিনিয়ার কান্নার আওয়াজ থেমে এল। শান্ত হল সে। বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"

উদ্দালক উঠল। জিনিয়া বলল, "সরি।"

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। এগুলো হতেই পারে। এখন অনেক রাত হয়েছে। কাল তো আপনাকে আবার আসতে হবে। এখানে থাকবেন কি? রাতে যিনি আসবেন, তাঁকে নাহয় আজ আসতে বারণ করে দেবেন?”

জিনিয়া বলল, “থাকতে পারব না আমি এখানে। পারছি না। আমার আজ শুধু মনে হচ্ছে ওকে আমি ঠকালাম বিয়ে করে।”

উদ্দালক বলল, “আপনি মাথা ঠান্ডা করুন। কেউ কাউকে ঠকায়নি। আপনি থাকবেন না এখানে তো? ঠিক আছে, চলুন শিয়ালদাই যাওয়া যাক।”

জিনিয়া বলল, “আপনি একদম ভালো সাজবেন না। আপনার ভালো সাজার নাটক আমি আর নিতে পারছি না।”

উদ্দালক বলল, “আচ্ছা বেশ। চলুন, শিয়ালদা তো যাবেন? ট্রেন ধরতে হবে তো। চলুন।”

জিনিয়ার চোখে আবার জল চলে এসেছিল। চোখ মুছে সে বলল, “চলুন।”

১০

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পল্টুকে বলা ছিল। একজন চেনা টোটোওয়ালা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে পল্টু সাইকেল নিয়ে গেছিল আগেই।

উদ্দালক সারা রাস্তা কোনওরকম কথা বলেনি। জিনিয়া পাথরের মতো বসে ছিল। পল্টুকে বলা ছিল। পল্টু অত রাত অবধি তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। রুটি, তরকারি দিয়ে তারপর গেল।

উদ্দালক দরজা খুলে বলল, "ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিন।"

জিনিয়া বলল, "আমার খিদে নেই।"

উদ্দালক বলল, "খিদে না থাকলেও খেতে হয়। আমিও খিদে না থাকলেও অনেক সময় খাই। প্রথম যখন হস্টেলে থাকতে গেছিলাম, সারাদিন বাড়ির জন্য মনখারাপ করত। খাওয়ার ওপর কোনও রাগ দেখাবেন না। পারলে গরম জলে স্নান করুন। ভালো লাগবে।"

জিনিয়া আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকল। সত্যি সত্যিই সে গরম জলে স্নান করে বেরিয়ে চেঞ্জ করে খেতে বসল। উদ্দালক সেটা দেখল, তবে কিছু বলল না।

সেও খেতে বসল। বলল, "রাত দেড়টার সময় রুটি ভালো লাগে না, যাই বলুন। সেই ট্রেনে দূরে কোথাও যেতে হলে বাড়ি থেকে শুকনো পরোটা করে দেয় না? দারুণ লাগে।"

জিনিয়া বলল, "আমি সরি। আপনার সঙ্গে আমি হঠাৎ করেই খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম, যেটা করা উচিত হয়নি। তবে আপনার মনে হয় না আপনি একটু বেশিই ভালো সাজছেন? এতটা ভালো হয় কি লোকে?"

উদ্দালক হেসে ফেলল। বলল, "দেখুন, আমি ভালো নই একবারেই। এটা এক্কেবারে ভুল ধারণা। প্রতিটা মানুষের ডার্ক সাইড থাকে। আমারও আছে। আমি সেলফিশ লোক। বিয়ে থা করতে চাইনি। এদিকে বাড়ি থেকে ক্রমাগত জোর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি পড়াশোনা করতে চাই। পৃথিবী দেখতে চাই। বিয়ে করলে তো সেটা সম্ভব ছিল না। আমি দেখলাম আপনি চাকরি করেন। সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। আমাকে কোনও দিন ভালোবাসবেন না। তার মানে ইমোশনালি পিছুটানের কোনও ব্যাপারও নেই। আপনাকে কলকাতায় রেখে আমি দিব্যি বেরিয়ে পড়তে পারব। এবার বলুন তো, আমার এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি কেন আপনাকে বিয়ে করব না? সব দিক থেকেই আপনি আমার জন্য পারফেক্ট পাত্রী। আমার পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আপনি ছাড়া কোনও অপশন আছে নাকি? আর ভালো সাজার কথা বলছেন? খামোখা খারাপই বা সাজতে হবে কেন? দুজন রুমমেট আছে। একজন রুমমেট একটু সমস্যায় পড়লে আর-একজন যাবেই।

কাল আমার শরীর খারাপ হলে আপনি প্যারাসিটামল কিনে আনবেন না? ব্যাপারটা এই। আর কিচ্ছু না।”

জিনিয়া বলল, “আপনার কাছে মাথা ধরার ওষুধ আছে? আমার মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামলের কথায় মনে পড়ল।”

উদ্দালক বলল, “খেয়েদেয়ে একটা প্যারাসিটামল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। না ঘুম এলেও চেষ্টা করুন। ফোনটা দূরে রেখে ঘুমান। ঘুম আসবে।”

জিনিয়া বলল, “ওকে। চেষ্টা করছি।”

উদ্দালক খেয়েদেয়ে থালা সিংকে রেখে বলল, “কাল থেকে এক মাসিকে আসতে বলেছি। রান্নাবান্না করে দেবে, ঘরদোর মুছে দেবে। থালা ধোয়ার দরকার নেই। মাসিই ধোবে।”

জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে।”

উদ্দালক স্টাডিরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জিনিয়া থালা সিংকে রেখে মুখ ধুয়ে বেডরুমে গিয়ে সৌপ্তিকের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল। ঘুম এল অনেক দিন পর। এতটাই ঘুম এল যে পরের দিন সকালে উদ্দালককে দরজা ধাক্কিয়ে চিৎকার করতে হল, "অফিস যাবেন না?"

ঘুম ঘুম গলায় জিনিয়া বলল, "আমি আজ যাব না। টোটোওয়ালাকেও বারণ করে দিন। ঘুম পাচ্ছে।"

উদ্দালক আর কিছু বলল না।

জিনিয়া ঘুমাচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দশটা বাজল। দেখল উদ্দালক স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাকে দেখে বলল, "সারাদিন একা একা কী করবেন? বই পড়তে পারেন, টিভি দেখতে পারেন। মাসি রান্না করে দিয়ে গেছে। খেয়ে নেবেন। সকালের জন্য রুটি আলুর দম আছে।"

জিনিয়া বলল, "খবরের কাগজ নেন না আপনি?"

উদ্দালক স্টাডিরুম থেকে কাগজ এনে দিয়ে বলল, "এই যে। আমি চেষ্টা করছি লাঞ্চ টাইমে একটু উঁকি দিয়ে যাওয়ার। যে-কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন।"

জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে।"

উদ্দালক বলল, "স্কুল থেকে সবাই মিলে ডাইনিং সেট, আরও কী কী সব দিয়েছে। টেবিলের ওপর রেখেছি। দেখে নেবেন। ওদের আবার খাওয়াতে হবে। আমি আসি। সাবধানে থাকবেন। বাড়িওয়ালা কাকিমাকে বলব আপনার সঙ্গে কথা বলতে?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "না, আমি আর-একটু ঘুমাতে চেষ্টা করি বরং।"

উদ্দালক বলল, "ফাইন। সেটাই বেস্ট হবে। আসি?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।

উদ্দালক বেরোতে জিনিয়া অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল যেতে পারবে না।

কিছু কাজ পেন্ডিং আছে জানালেন সুপ্রতিম। জিনিয়া জানাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে যতটা সম্ভব করে দেবে সে। টিভি চালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখল জানলা দিয়ে পল্টু উঁকি মারছে, "আজ স্কুল ডুব দিয়েছি। স্যার জানেন না। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। দেখি জানলা খোলা। আপনি অফিস যাননি বউদি?"

জিনিয়া হাসল, "না, যাইনি। তুমি স্কুল ডুব মারলে কেন?"

পল্টু মাথা চুলকে বলল, “স্কুল আমার ভালো লাগে না। স্যারের ক্লাস ছাড়া একটা ক্লাসও ভালো না। আচ্ছা আপনি ডাব খাবেন?”

জিনিয়া বলল, “কোত্থেকে আনবে তুমি?”

পল্টু বলল, “একটু অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসি।”

সাইকেল বাঁই বাঁই করে চালিয়ে পল্টু চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ডাব এনে বলল, “এ নিন। আমাদের গাছের। আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নেব। চানাচুর খাবেন? দিয়ে যাচ্ছি!”

জিনিয়া হেসে ফেলল। এ ছেলেটা এক্কেবারে পাগল তো!

১১

দুপুরবেলা।

জিনিয়া বই পড়ছিল উদ্দালকের স্টাডিরুমে। টেনিদা সমগ্র। পল্টু আমের আচার দিয়ে গেছে। আচার খেতে খেতে বই পড়তে বেশ ভালো লাগছিল। ফোন বাজতে শুরু করল তার। দেখল মা ফোন করছে। ধরল, “বলো।”

মালতী বললেন, “কি রে, অফিসে আছিস মা?”

জিনিয়া বলল, “না, আজ অফিস যাইনি।”

মালতী বললেন, “ও। জামাইও যায়নি?”

জিনিয়া বলল, “কে জামাই?”

মালতী একটু থমকে বললেন, “উদ্দালক।”

জিনিয়া বিরক্ত গলায় বলল, “এরকম জামাই জামাই বলবে না। শুনতে ভালো লাগে না। নাম ধরে ডাকো।”

মালতী বললেন, “আচ্ছা। বলব না। উদ্দালক স্কুলে যায়নি?”

জিনিয়া বলল, “গেছে।”

মালতী বললেন, “কাল কী হয়েছিল?”

জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকের বাড়ি গেছিলাম। ওখানেই ছিলাম। রাতে জানালাম তো।”

মালতী বললেন, "সেটা তো জানি ওখানে ছিলি। কিন্তু গিয়ে ঠিক কী সমস্যা হয়েছিল সেটা তো বলতে পারিস?"

জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকের কথা মনে পড়ছিল। কী করব বলো? ভালোবেসেছিলাম তো। এত সহজে তো ভোলা যায় না।"

মালতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "উদ্দালক রাগ করেনি?"

জিনিয়া বলল, "জানি না। করতেও পারে। তাতে আমি কী করব?"

মালতী বললেন, "দেখ তিন্নি, কোনও ছেলে অন্য কারও অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না। তুই উদ্দালকের সামনে বেশি সৌপ্তিকের কথা বলিস না। ঠিক আছে?"

জিনিয়া কোনও তর্ক না করে বলল, "ঠিক আছে। তোমার আর কিছু বলার আছে? রাখলাম।"

মালতী কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল জিনিয়া।

উদ্দালক ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বলল, “খেয়ে নি চলুন। বাহ, ভালো বই পড়ছেন তো। ‘তপন চরিত’ পড়ে দেখতে পারেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বেশি লোক পড়েনি। ভালো লাগবে দেখবেন।”

জিনিয়া উঠল। বলল, “আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা কথা বলুন।”

উদ্দালক বলল, “কী কথা?”

জিনিয়া বলল, “আমার মা বলল কোনও ছেলে অন্য কারও অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না। আপনার সামনে সৌপ্তিকের কথা বললে আপনি মেনে নিতে পারেন না?”

উদ্দালক বলল, “ধুস, আমার কেন ওসব হবে? আমরা তো কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজ করেছি। ওসব যারা সারাক্ষণ প্রেম প্রেম করে লাফায় তাদের মধ্যে হতে পারে। আমাদের বাঙালিদের সমস্যা হল, আমরা সারাজীবন প্রেমটাই করে যাই। প্রেম ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে। তার মধ্যে সবথেকে উপরের দিকে আছে পড়াশোনা। সর্বক্ষণ রিলেশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে করে আমরা পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে দি। ক্লাস এইট-নাইন থেকে পাবলিক আজকাল প্রেম করতে শুরু করে। এই তো পল্টুদের ক্লাসের বিনোদ নাকি এখনই প্রেম করে। কী হবে প্রেম করে? নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা মার খাবে। আর কম বয়সের মেয়ে বাচ্চা কোলে ঘুরে বেড়াবে। ভালোবাসা জিনিসটাই বোগাস বুঝলেন?”

জিনিয়া বলল, “আপনি এত কিছু কী করে বুঝলেন? আপনি কোনও দিন কোনও রিলেশনে ছিলেন?”

উদ্দালক জোরে হেসে উঠল, “খেপেছেন? আমাকে পাগল কুকুরে কামড়েছে যে আমি রিলেশনে যাব? আমার বরাবর পাখির চোখ একটাই। আরও পড়াশোনা করে যাওয়া। আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন রিলেশনশিপ। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন?”

জিনিয়া চুপ করে ডাইনিং টেবিলে বসল। উদ্দালক খাবার বেড়ে দিল। জিনিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “আপনার কি ধারণা প্রেম করে বিয়ে হলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে? আমার আর সৌপ্তিকের বিয়ে হলে প্রেম নষ্ট হতে পারত ভবিষ্যতে?”

উদ্দালক বলল, “কেস ভ্যারি করে। এক-একজনের এক-একরকম হয়। আপনার কী হত, সেটা আমি কী করে বলব? হতে পারে সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে সংসার করে, ঝগড়া করে, বাচ্চা নেওয়ার পরে এখন যে ভালোবাসাটা আপনি ওকে বাসেন, তখন নাও বাসতে পারতেন। আবার উলটোটাও হতে পারে। খুব ভালো সংসার করতেন। কোনও কিছুই আগে থেকে বলা সম্ভব না। পৃথিবীতে সবটাই অনিশ্চয়তায় চলে। আজ আমরা বেঁচে আছি, ঠিক দশ মিনিট পরে ভয়াবহ একটা ভূমিকম্পে সব শেষও হয়ে যেতে পারে। কিছুই বলা যায় না।”

জিনিয়া গম্ভীর মুখে বলল, "সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে অবশ্যই ভালো করে সংসার করতাম আমি।"

উদ্দালক বলল, "নিশ্চয়ই। এ নিন। মাছের ঝোলটা ভালো হয়েছে।"

জিনিয়া বলল, "আমার খিদে পাচ্ছে না। পরে খাব।"

উদ্দালক বলল, "খেয়ে নিন। বললাম না, ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের খেয়ে নিতে হয়। নিন, মাছ নিন।"

জিনিয়া আর কোনও কথা বলল না।

১২

ক্লাস নাইন এ-র ছেলেরা খুবই ভালো। ঝামেলাও করে না। উদ্দালক একগাদা অঙ্ক দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। লাস্ট পিরিয়ড। সে যখন স্কুলে পড়ত, এই সময়টা বাইরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে যেত। এই ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের কয়েকটা ছেলের মধ্যে সেরকম হাবভাব দেখা যাচ্ছে। উদ্দালক গলা তুলে ডাকল, "এই তোরা এদিকে আয় দেখি খাতা নিয়ে।"

চারটে ছেলে খাতা নিয়ে তার সামনে এল। উদ্দালক খাতাগুলো দেখল। নিতান্ত দায়সারাভাবে প্রশ্নটা টুকে খাতার মধ্যে আঁকিবুকি কেটেছে। সে বলল, "ইচ্ছা করে না ক্লাস করতে তোদের?"

ছেলেগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

উদ্দালক বলল, "কী করবি স্কুল ছুটি হলে?"

একজন বলল, "ফুটবল খেলতে যাব স্যার।"

ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। উদ্দালক বলল, "সে তো যাবি। কিন্তু ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবি না? মন নেই? সামনের বছর মাধ্যমিক তো। এই সময়টা ক্লাসটা ঠিক করে কর অন্তত, যা বেঞ্চে গিয়ে বস।"

সবাই বেঞ্চে গিয়ে বসল। উদ্দালক বোর্ডে অঙ্কগুলো কষে দিয়ে বলল, "যা তোদের ছুটি। কাল অঙ্কগুলো ফ্রেশ করে করে নিয়ে আসবি।"

ছেলেদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য এবং অবিশ্বাস দেখা দিল। উদ্দালক শেষ বেঞ্চ থেকে সবাইকে একে একে ছেড়ে দিয়ে টিচার্স রুমের দিকে রওনা দিল। করিডরে হেডস্যার

তপনবাবুর সঙ্গে দেখা হল তার। হেডস্যার অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী? তুমি এখনই সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে কেন? পনেরো মিনিট বাকি ছিল তো?"

উদ্দালক বলল, "লাস্ট পিরিয়ডে কেউ ম্যাথস দেয় স্যার? এদের মাথা কাজ করে? ছেড়ে দিলাম টাস্ক দিয়ে।"

তপনবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "তা বটে। লাস্ট পিরিয়ডে অঙ্ক দিতে নেই। ঠিকই বলেছ তুমি, আমার ছোটোবেলাতেও এই সময় আমার ক্লাস করতে একবারেই ইচ্ছা করত না। তবে ইদানীং ছেলেরা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হয়ে পড়ছে। দেখা গেল, তুমি তাড়াতাড়ি ছেড়েছ বলে পেরেন্টস-টিচার মিটিংয়ে এদের বাপ মা তোমার নামেই নালিশ ঠুকে দিল।"

উদ্দালক বলল, "খুব চান্স আছে স্যার এটা হবার। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এদের মতো ছিলাম না। প্রথম দিকের ছেলেপিলেরা বড্ড সেলফিশ আর মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। আমার তাই লাস্ট বেঞ্চের ছেলেই পছন্দ।"

তপনবাবু খুশি হলেন, "তা যা বলেছ। তবে আমাদের সময় লাস্ট বেঞ্চে অনেক বেশি নটোরিয়াস এলিমেন্ট থাকত। এসব তো কিচ্ছু না। বাপরে! যা লেভেলে হেড়ুর মিমিক্রি নামত..." বলেই তপনবাবু জিভ কেটে বললেন, "দেখেছ, এখন যে আমিই হেড়ু, সেটাই ভুলে গেছি।"

উদ্দালক হেসে ফেলল। তপনবাবু বললেন, “যাক গে, এসব বাদ দাও। ম্যারেড লাইফ কেমন কাটছে বলো?”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে স্যার। কোনও সমস্যা নেই।”

তপনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “সমস্যা? সমস্যা কেন থাকতে যাবে হে? সমস্যার তো কারণ নেই।”

উদ্দালক সহজ হবার চেষ্টা করল, “না মানে ওই আর কি।”

তপনবাবু বললেন, “ওই আর কি না। করেছ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজ কি সবার দ্বারা হয় রে ভাই? এখন হাজার রকম লজ্জা আসবে। তুমি ঘুরতে নিয়ে যাও কোথাও মিসেসকে! আমি তোমার ছুটির ব্যবস্থা করছি।”

উদ্দালক বলল, “সে যাব স্যার। দেখি কথাবার্তা বলে।”

তপনবাবু বললেন, “যাক গে, ক্লাস যখন ছুটি দিয়ে দিয়েছ, আটকে রাখব না আর তোমাকে। যাও যাও। বাড়ি যাও।”

উদ্দালক হেসে বেরোল।

স্কুল থেকে ফেরার পথে সাইকেল নিয়ে এলাকাটা চক্কর দিতে ভালোই লাগে। উদ্দালক ধীরে ধীরে প্যাডেল করছিল। পল্টু বড়ো পুকুরের দিক থেকে ছিপ নিয়ে ফিরছিল। উদ্দালক ধমক দিল, “অ্যাই, আজ স্কুল ডুব দিলি কেন?”

পল্টু দাঁত বের করল, “ইচ্ছা করছিল না স্যার। এই দেখুন না, বউদির জন্য মাছ ধরতে এসেছিলাম। ভালো চারা পেয়েছি। নিয়ে যাব রাত্তিরে।”

উদ্দালক বলল, “সে যাই কর, স্কুল কামাই করলে কিন্তু তোর বাবার কাছে রিপোর্ট করব আমি জানিয়ে রাখলাম।”

পল্টু পালাল।

উদ্দালক হাসতে হাসতে আবার সাইকেল নিয়ে রওনা দিল।

১৩

ফিরে বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর জিনিয়া ঘুমচোখে দরজা খুলল। উদ্দালক অপরাধী গলায় বলল, “ঘুমাচ্ছিলেন বুঝি? বাজে ব্যাপার হয়ে গেল। কাল থেকে এক্সট্রা চাবি নিয়ে যাব।”

জিনিয়া বলল, “না, ঠিক আছে।”

উদ্দালক ফ্রেশ হল। স্টাডিরুমে গিয়ে তক্তপোশে শুল।

জিনিয়া ঘরের বাইরে এসে বলল, “আসতে পারি?”

উদ্দালক তড়িঘড়ি উঠে বসল, “আসুন।”

জিনিয়া ঘরে ঢুকে বলল, “আপনার একটা ডায়েরি ও ঘরে পেলাম। পড়ে ফেলেছি, সরি।”

উদ্দালক হাসল, “ওহ, ওটা কিছু না। পড়লেও অসুবিধা নেই।”

জিনিয়া বলল, “আপনি ডায়েরি লেখেন?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ লিখি। আপনি লেখেন নাকি?”

জিনিয়া বলল, “নাহ। লেখাপড়ার অভ্যাসটাই চলে গেছে এখন।”

উদ্দালক বলল, "লিখলে অনেকটা হালকা হওয়া যায়। যাক গে, আপনি চা খাবেন? করব তাহলে।"

জিনিয়া বলল, "আমি করছি। আপনি বসুন।"

উদ্দালক হাসল, "বেশ।"

জিনিয়া চা করে নিয়ে এল। উদ্দালক চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "বাহ। ভালো হয়েছে।"

জিনিয়া বলল, "আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

উদ্দালক বলল, "নিশ্চয়ই। করুন।"

জিনিয়া বলল, "আপনি আদৌ এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবেন? আমার কেন জানি না মনে হয় আপনি কোথাও যাবেন না। এখানেই দিব্যি সেটল করে যাবেন।"

উদ্দালক মাথা নাড়ল, "জানি না। নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে কোথাও যাওয়া তো, নাও যেতে পারি। কেন বলুন তো?"

জিনিয়া বলল, "এমনিই। সারাদিন ধরে একগাদা প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে শুরু করে যার কোনও মানে হয় না। এর মধ্যে পল্টু এসে ডাব দিয়ে গেল, আচার দিয়ে গেল। আন্তরিকতা আছে জায়গাটার।"

উদ্দালক বলল, "প্রতিটা মানুষের মতো প্রতিটা জায়গাই স্পেশাল। কেউ খারাপ না। শুধু ভালোটা দেখে নিতে হয়। এই যেমন আপনার আজকে রেস্টটা দরকার ছিল দিব্যি বুঝতে পারছি। ঘুমিয়ে আপনাকে ফ্রেশও লাগছে।"

জিনিয়া বলল, "হতে পারে। আবার কখন মনখারাপটা চলে আসবে সেটা ভেবেও ভয় লাগে। বিয়ের দুনিয়ায় আমাকে বোধহয় কেউ বিয়ে করত না। আমি ডিসপুটেড মেটিরিয়াল। আমার হাজারখানেক সমস্যা আছে। নিজেও বুঝি, আমার মানসিক সমস্যাও আছে। ভাগ্যিস আপনি এমন একটা প্রস্তাব দিলেন। আর আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। মুড অফ থাকলে আমি যা নয় তাই বলতে থাকি। নিজের মধ্যে থাকি না তখন আর।"

উদ্দালক বলল, "কোনও অসুবিধা নেই। বলে যদি হালকা হতে পারেন, একশোবার বলবেন। কন্ট্র্যাক্ট টার্মিনেট করতে হলেও বলবেন। আমার কোনও প্রবলেম নেই।"

জিনিয়া বলল, "প্রবলেম হবে না? আপনি সত্যিই এতটা কোল্ড হার্টেড লোক?"

উদ্দালক বলল, “ভীষণ। আমি ভীষণ স্বার্থপরও বটে। নিজেরটা ছাড়া আমি কারোটা বুঝি না।”

জিনিয়া বলল, “রিয়ালি?”

উদ্দালক বলল, “রিয়ালি। তবে আমি লাজুক টাইপের সেলফিশ লোক। এই যেমন আমার এখন ঘুমোতে ইচ্ছা করছে, আপনার সঙ্গে বকবক করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু আপনি বসে আছেন বলে ভদ্রতার খাতিরে বলতেও পারছি না, ব্যাপারটা সেরকমই আর কী!”

জিনিয়া বলল, “এক্সট্রিমলি সরি। আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি আসছি।”

উদ্দালক বলল, “থ্যাংক ইউ।”

জিনিয়া উদ্দালকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার হঠাৎ খুব কান্না পেল।

এত রূঢ়ভাবে কথাটা বলতে পারল?

সে বেডরুম থেকে আবার উদ্দালকের ঘরে গিয়ে নক করল, “শুনুন।”

উদ্দালক চোখ বুজেছিল। সে অবস্থাতেই বলল, (এরপর উদ্দালকের কথা থাকার কথা। তারপর জিনিয়ার।) “আপনি আমার সঙ্গে ব্যবহারটা ভালো করলেন না। খারাপ লাগল। সৌপ্তিক থাকলে কখনও এরকম করত না।”

উদ্দালক বলল, “সরি। তবে প্রতিটা মানুষ এক হয় না। আমিও তেমন সৌপ্তিক নই। আপনাকে ভালোও বাসি না। এটা আপনাকে বুঝতে হবে।”

জিনিয়ার চোখ ফেটে জল আসছিল। তবু সে বলল, “আপনি মানুষটা মোটেও ভালো নন। আপনার প্রায় সবটাই লোকদেখানো।”

উদ্দালক বলল, “সেটাও হতে পারে। আর কিছু না বলার থাকলে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন।”

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে তার রুমের দিকে রওনা দিল।

১৪

জিনিয়ার মাথা গরম হয়ে ছিল। ঠিক কেন গরম হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না।

কিছুক্ষণ টিভি দেখে ভালো লাগল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। সৌপ্তিকের ছবির দিকে তাকাল।

সৌপ্তিক হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

জিনিয়া বলল, “ভালো লাগছে না তোর? খুব মজা পাচ্ছিস বল আমি এভাবে কষ্ট পাচ্ছি দেখে? পা। তাতে যদি ভালো থাকিস তো থাক।”

ফোন বেজে উঠল। জিনিয়া দেখল সুলগ্না ফোন করছে, ধরতে ইচ্ছা করল না প্রথমে।

সুলগ্না ছাড়ার মেয়ে না। আবার ফোন করা শুরু করল।

এবারে ধরল জিনিয়া, “বল।”

সুলগ্না বলল, “তুই কি এখনও আমার উপর রাগ করে আছিস?”

জিনিয়া বলল, “কেন রাগ করব? কী হয়েছে?”

সুলগ্না বলল, "কাল অফিস থেকে বেরিয়ে গেলি। আন্টি ফোন করেছিলেন আমাকে। আমি তো বুঝেছিলাম তুই সৌপ্তিকের বাড়ি গেছিস, কিন্তু কাল আমার ওভাবে তোকে বলা উচিত হয়নি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি ভাই।"

জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে। রাখ এখন। ভালো লাগছে না।"

সুলগ্না বলল, "সে নাহয় রাখব। তোর শরীর ঠিক আছে তো?"

জিনিয়া বলল, "হুঁ।"

সুলগ্না বলল, "কাল অফিস আসবি?"

জিনিয়া বলল, "আসব। রাখি এবার?"

সুলগ্না বলল, "আমি সত্যিই সরি রে। আমি বুঝতে পারছি তুই ভীষণ রেগে আছিস।"

জিনিয়া বলল, "বারবার এক কথা বললে আমি আরও রেগে যাব। রাখ ফোনটা। আমার কাজ আছে।"

সুলগ্না বলল, "কী কাজ রে? সংসারের কাজ? এই তুই বাসন মাজিস? কাপড় কাচিস?"

জিনিয়া বলল, "আমার সিরিয়াসলি তোর সঙ্গে এখন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না সুলগ্না। রাখলাম।"

সুলগ্না কিছু বলার আগেই জিনিয়া ফোন কেটে দিল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল সে। সদাশিববাবু কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, "ভালো আছ তো বউমা? সব ঠিক আছে? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

জিনিয়া হাসল, "হ্যাঁ, ভালো আছি। অসুবিধা হচ্ছে না কোনও।"

সদাশিববাবু বললেন, "কাগজ পড়বে?"

জিনিয়া বলল, "না না। আমি একটু বসি।"

সদাশিববাবু বললেন, "বেশ, বসো।"

সদাশিববাবুর স্ত্রী শোভনা তাকে দেখেছিলেন। দুজনের জন্যই চা নিয়ে এলেন। চা-টা খেয়ে জিনিয়ার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বলল, "খুব ভালো চা তো।"

শোভনা বললেন, "আমার ভাই দার্জিলিং গেছিল। নিয়ে এসেছে। সত্যিই খুব ভালো। তোমরা কোথাও বেড়াতে যাবে না?"

জিনিয়া বলল, "ঠিক হয়নি কিছু। দেখা যাক। আমার অফিসে ছুটি পাওয়া খুব সমস্যার।"

শোভনা বললেন, "ছুটি না পেলে জোর করে যাবে। হানিমুনে না গেলে হয় নাকি? এই তো বিয়ে করেই দুজনে স্কুল অফিস শুরু করে দিলে। এগুলো খুব খারাপ। একসঙ্গে কোথাও ঘুরে এসো। দেখবে খুব ভালো লাগবে। এখনই তো ঘোরার বয়স। আমরা বিয়ের পরে পুরী গেছিলাম। তখন তো দিঘা, পুরী আর দার্জিলিংই যেত সবাই। এখন কতরকম যাওয়ার জায়গা হয়েছে।"

জিনিয়া চুপ করে চা খেতে লাগল।

সদাশিববাবু বললেন, "আমরা গত বছর এই সময়েই গোয়া গেছিলাম। মন্দ লাগেনি, কী বলো গিন্নি?"

শোভনা বললেন, "ধুস, গোয়া এই বয়সে কি পোষায়? আমার বাপু পাহাড়ই ভালো লাগে। হাঁটুতে ব্যথা হয় যদিও পাহাড় ভাঙতে, তবু পাহাড়ের ধারেকাছে কিছু হয় না। তোমার কী ভালো লাগে বউমা?"

জিনিয়ার মনে পড়ে গেল তার আর সৌপ্তিকের ঠিক হয়েছিল দুজনে মিলে পাহাড়ে যাবে। সে একটু থমকে বলল, "পাহাড় ভালো লাগে।"

শোভনা হাসলেন, "যাক, তাহলে তুমিও আমার দলেই পড়লে। ভালো হল। এবার তোমার বরকে জোর করো পাহাড়ে নিয়ে যেতে। ঘুরে এসো বউমা, এই সময় আর ফিরে আসবে না বিশ্বাস করো। যাও যাও।"

পারলে শোভনা এখনই তাদের পাঠিয়ে দেন।

জিনিয়ার হাসি পেল। বলল, "আচ্ছা বলব।"

১৫

পল্টু পড়তে এসেছে একগাদা চারাপোনা নিয়ে। উদ্দালক বলল, "এগুলো কে বাছবে?"

পল্টু বলল, "আমিই বেছে দেব স্যার। বউদির ভালো লাগবে।"

উদ্দালক বলল, "তুই পড়বি, না মাছ বাছবি?"

পল্টু বউদি বউদি করে ডাকতে লাগল। জিনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পল্টু বলল, “এই দেখুন বউদি, এই মাছগুলো আমি ধরেছি।”

জিনিয়া বলল, “বাহ।”

উদ্দালক বলল, “এই তুই পড়তে বোস। পরে দেখছি মাছগুলো নিয়ে কী করা যায়।”

পল্টু মাথা চুলকে স্টাডিতে চলল উদ্দালকের সঙ্গে। জিনিয়া মাছগুলো ধুয়ে, কেটে, ভেজে এক প্লেট মাছভাজা নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকে বলল, “এই নাও পল্টু, ভেজে আনলাম।”

পল্টু খুব খুশি হয়ে বলল, “আরিব্বাস, বউদি রান্না জানেন। এটা খুব ভালো হল। আপনি খেয়েছেন বউদি?”

জিনিয়া বলল, “না, আমি খাব। তুমি খাও।”

পল্টু বলল, “না, তা কী করে হয়? আপনার জন্য আনলাম তো। আপনি খান আগে।”

অগত্যা জিনিয়াকে একটা মাছভাজা খেতে হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা বিঁধল। ছোটো মাছের কাঁটা। গলায় থাকবে না বেশিক্ষণ, কিন্তু কাশি হতে শুরু করল।

পল্টু শশব্যস্ত হয়ে বলল, "স্যার মুড়ি আছে? মুড়ি খেলে ঠিক হয়ে যাবে।"

উদ্দালক বলল, "মুড়ি মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। নিয়ে আয় শিগগির।"

পল্টু দৌড়োল।

জিনিয়ার ছোটো মাছ খাওয়া অভ্যাস নেই। বাড়িতে থাকতেও সে খেত না। কাশতে কাশতে বমি চলে এল তার। উদ্দালক জিনিয়ার হাত ধরে বলল, "চলুন চলুন। আপনি ছোটো মাছ খান না বলবেন তো!"

বেসিনে গিয়ে খানিকটা কেশে গলায় আঙুল দিয়ে কাঁটা বের করতে খানিকটা বমি হয়ে গেল।

উদ্দালক জিনিয়াকে ধরে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে মাথায় ঘাড়ে জল দিয়ে বলল, "এখন ঠিক লাগছে?"

জিনিয়ার কাশি থেমেছিল। সে কোনওমতে বলল, "খানিকটা।"

উদ্দালক জিনিয়ার হাত ধরে বলল, "দেখি নাড়িটা।"

জিনিয়া হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, “নাড়ি দেখার কী আছে? আমার কি জ্বর এসেছে?”

উদ্দালক বলল, “তাও ঠিক, জ্বর আসবে কেন? তবু আপনি শুয়ে পড়ুন। অনেক কাশলেন তো।”

জিনিয়া বলল, “আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন।”

উদ্দালক বলল, “সে তো করছি। আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না?”

জিনিয়া বলল, “কী ভাববেন? বিকেলবেলা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোলেন। কোনও সুস্থ মানুষকে দেখিনি বিকেলবেলা এভাবে ঘুমোতে পারে।”

উদ্দালক বলল, “ওহ, সে তো একটু ঘুমোতেই হবে, নইলে রাতে পড়ব কী করে? কেন, আপনি কি বেরোতেন কোথাও?

জিনিয়া বলল, “বাজার যেতে হত আমায়। কিছু জিনিস কেনার ছিল।”

উদ্দালক বলল, “আরে এই ব্যাপার? লিখে দিন না কী লাগবে, পল্টু নিয়ে আসবে।”

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড কড়া চোখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "পল্টুকে দিয়ে সব আনানো সম্ভব? আপনার কি বই বাদ দিয়ে অন্য কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই?"

উদ্দালক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল, "এ বাবা, সরি, সরি। আচ্ছা আপনি তৈরি হয়ে নিন। ঘুরে আসি বাজার থেকে।"

জিনিয়া বলল, "মাছগুলো কে খাবে?"

উদ্দালক বলল, "ও পল্টু আসুক, একাই খেয়ে নেবে। আমি ওকে অঙ্ক দিয়ে যাচ্ছি। চলুন। ঘুরেই আসি।"

পল্টু মুড়ি নিয়ে এল। উদ্দালক পল্টুকে একগাদা অঙ্ক করতে দিয়ে বলল, "সব বসে বসে কর। আমি বউদিকে নিয়ে আসছি।"

পল্টু বড়ো করে মাথা নাড়ল।

জিনিয়া সালোয়ার কামিজ পরে বেরোল। উদ্দালক বলল, "সাইকেলের পিছনে বসতে পারবেন?"

জিনিয়া বলল, "বসিনি কোনও দিন। সামনেই বসি।"

উদ্দালক বলল, “সামনে বসবেন? আচ্ছা বসুন।”

সন্ধে নেমেছে। জিনিয়াকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে উদ্দালক সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল। জিনিয়ার ভালো লাগছিল। কোত্থেকে একটা মিষ্টি হাওয়া আসছে।

বাজারে পৌঁছে কসমেটিক্সের দোকানে জিনিয়া অনেক সময় নিয়ে নিল। উদ্দালক দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। ফেরার সময় জিনিয়া আবার সামনের সিটে বসল।

বাজার যাওয়ার সময় অতটা হয়নি। ফেরার সময় জিনিয়ার মনে হল উদ্দালকের উষ্ণ নিঃশ্বাস তার ঘাড়ে পড়ছে। ভালো লাগছিল তার। খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ শিউরে উঠল সে।

এ কী করতে যাচ্ছিল সে?

জিনিয়া বলল, “সাইকেল দাঁড় করান প্লিজ।”

উদ্দালক সাইকেল দাঁড় করিয়ে বলল, “কী হল?”

জিনিয়া বলল, “আমি হেঁটেই ফিরব।”

উদ্দালক অবাক গলায় বলল, "সে আবার কী? অনেকটা পথ তো!"

জিনিয়া বলল, "না, আমি হেঁটেই ফিরব।"

উদ্দালক সাইকেল থেকে নামল, "বেশ। তাই সই। চলুন। দিন, আপনার হাতের ব্যাগটা আমায় দিন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দি।"

জিনিয়া দিল। উদ্দালক চুপ করে হাঁটতে লাগল।

জিনিয়া বলল, "আমার বিয়েটা করা ঠিক হয়নি। সৌপ্তিককে ঠকানো হয়ে যাচ্ছে।"

উদ্দালক বলল, "এটা আবার কখন থেকে মনে হচ্ছে?"

জিনিয়া বলল, "এই তো। এখন থেকেই। আমি... কী বলব..."

উদ্দালক বলল, "ফিজিক্যালি আমার প্রতি অ্যাট্রাকটেড হচ্ছেন?"

জিনিয়া থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কড়া গলায় বলল, "এরকম মনে হচ্ছে কেন আপনার?"

উদ্দালক বলল, "আপনার মনের মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করে তো। একটা সত্তা সৌপ্তিককে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। এরকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। ইট হ্যাপেনস।"

জিনিয়া রেগে গেল, "খুব জানেন না? খুব বেশি বুঝে গেছেন? পড়ান তো এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের স্কুলে। তাও কথা বলছেন যেন বড়ো কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট!"

উদ্দালক হাসল, "আপনার এই দ্বন্দ্বটা ভীষণ স্বাভাবিক একটা দ্বন্দ্ব। হতে পারে আমি ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের আরও লঝঝড়ে মাস্টারমশাই, কিন্তু সত্যিটা স্বীকার করলে কি আপনার খুব একটা ক্ষতি হবে? একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একসঙ্গে থাকলে এগুলো হতেই পারে। ইন ফ্যাক্ট আমিও আপনার প্রতি ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন বোধ করি না বললে অন্যায় হবে। এগুলো হয়। পরিণত সম্পর্কে শরীর আসে। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাজ হল সেটা থেকে নিজেদের দূরে রাখা, মানে আমাদের মতো সিচুয়েশনে।"

জিনিয়া বলল, "আমি সৌপ্তিককে খুব ভালোবাসি। আর আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন।"

উদ্দালক বলল, "আপনি সৌপ্তিককে ভালোবাসেন না, আমি একবারও বলিনি। সাইকেল থেকে নামলেন কেন?"

জিনিয়া বলল, "এমনি। আমার হাঁটতে ভালো লাগে।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। হাঁটুন।"

জিনিয়া বলল, "আমি বাড়ি চলে যাব। আপনার সঙ্গে থাকব না।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। কালকেই চলে যাবেন?"

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। কালকে চলে যাব।"

উদ্দালক বলল, "ফাইনাল?"

জিনিয়া বলল, "ফাইনাল।"

উদ্দালক আর কিছু বলল না। চুপচাপ সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

১৬

বাড়ি ফিরে জিনিয়া ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

উদ্দালক দেখল পল্টু অঙ্ক নিয়ে তখনও হাবুডুবু খাচ্ছে। সে বলল, "কি রে, কটা হল?"

পল্টু বলল, “একটাও হচ্ছে না স্যার।”

উদ্দালক শ্বাস ছেড়ে বলল, “বস। তোকে নিয়ে আর পারি না সত্যি।”

পল্টু বলল, “স্যার, বউদি কোথায় গেলেন?”

উদ্দালক বলল, “তোর কী তাতে? পড়তে এসেছিস, পড়ে যা। বউদি কোথায় তোর জেনে কী হবে? দেখি আয়।”

পল্টুর মুখটা শুকিয়ে গেল। উদ্দালক গম্ভীর মুখে পল্টুকে অঙ্ক করিয়ে গেল।

পল্টু যাওয়ার পরে জিনিয়া একবার বেরিয়ে এসে খেয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল।

উদ্দালক খেয়ে পড়তে শুরু করল।

পরদিন ভোর হতেই জিনিয়া ব্যাগপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে বলল, “আমাকে টোটো ডেকে দিন। আমি চলে যাব।”

উদ্দালক দাঁত মাজছিল। বলল, “বলে দিয়েছি অলরেডি। এসে দাঁড়িয়ে আছে বা এখনই আসবে দেখুন।”

জিনিয়া কোনও কথা না বলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

উদ্দালক ব্রাশ করে বই নিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পর সদাশিববাবু জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন, "বউমা কি চলে গেল? ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বেরোল দেখলাম যেন।"

উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষের কৌতূহল বড্ড বেশি। বলল, "হ্যাঁ। বাড়ি গেছে।"

সদাশিববাবু অবাক গলায় বললেন, "যাহ। কালকেই বলল আপনাকে বলবে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা, আর আজকে চলে গেল?"

উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ, বিশেষ কাজ পড়ে গেছে। আপনি বাজার যাবেন না? এরপরে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে তো।"

সদাশিববাবু বুঝলেন উদ্দালক তাঁকে কাটাতে চাইছে। বললেন, "ও হ্যাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, যাই বরং।"

উদ্দালক চুপ করে বই পড়তে লাগল। স্কুলের সময় হলে তৈরি হয়ে স্কুলে গেল।

স্কুলে ঢুকেই হেডস্যারের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে বললেন, "ঠিক করলে কোথায় যাবে?"

উদ্দালক হেসে বলল, "না স্যার, এখনও ডিসিশন নিতে পারিনি। দেখি।"

হেডস্যার বললেন, "ঠিক হলে ছুটি নিয়ে নিয়ো। ট্রেনের টিকেট তো এখন তৎকালে পাবে না। ফ্লাইটেই যেতে হবে। আমার বাপু প্লেনে বড্ড ভয় করে। ছেলে জোর করে আন্দামান নিয়ে গেছিল। বাপ রে বাপ, ওসব আমার পোষায় না।"

উদ্দালক বলল, "আচ্ছা স্যার দেখব।"

তপনবাবুর সামনে থেকে সরে উদ্দালক টিচার্স রুমে গিয়ে বসল। তারাপদ স্যার আর সমরেশবাবু আবার ঝগড়া শুরু করেছেন। সুদেববাবু তার দিকে তাকাচ্ছেন না। রাগ এখনও পড়েনি বোঝা যাচ্ছে।

প্রথম ক্লাসটা সিক্সের। প্রেয়ারের পর ক্লাসে গিয়ে পড়াতে শুরু করল সে। এ সেকশন হলেও নিচের ক্লাস বলে ছেলেরা বড্ড দুরন্ত। ধমকধামক দিতে ইচ্ছে করে না কোনওবারেই। উদ্দালক একগাদা অঙ্ক দিয়ে দিল। ছেলেগুলো অঙ্ক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সিক্সের পাশের ক্লাস সেভেন বি। জানলা দিয়ে ক্লাসের বাইরেটা দেখা যায়। উদ্দালক দেখল পল্টুকে নিল ডাউন করিয়ে রাখা হয়েছে। সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখল উদয় স্যারের ইতিহাস ক্লাস। পল্টু ফিসফিস করে বলল, "স্যার ইতিহাস বই আনতে ভুলে গেছি।"

উদ্দালক বলল, "খেতে ভুলে যাস না?"

পল্টু ভালো মানুষের মতো মাথা নেড়ে বলল, "না।"

উদ্দালকের হাসি পেল। সে আবার তার ক্লাসে ফিরে এল। ছেলেরা অঙ্ক নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। পিছনের বেঞ্চের কয়েকটা ছেলেকে বেঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে দিল। ছেলেগুলো হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন এর থেকে আনন্দের কাজ আর কিছু হতে পারে না।

কয়েকজনের খাতা দেখে হতাশায় মাথা নাড়ল উদ্দালক। অঙ্কের অবস্থা খুব খারাপ। বলল, "আজ লাস্ট ক্লাসের পরে কেউ বাড়ি যাবে না। এক্সট্রা ক্লাস নেব।"

ছেলেরা হতাশ মুখে মাথা নাড়ল। ক্লাসটা শেষ হলে উদ্দালক টিচার্স রুমে গিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করল।

অনেক দিন পর স্কুল পালাতে ইচ্ছা হল। স্কুল পালিয়ে কোথায় যাওয়া যেতে পারে? সিনেমা হলে? ভেড়ির তীরে ভারী সুন্দর হাওয়া দেয়। ওখানে গিয়েও চুপ করে বসে থাকলে মন্দ হত না।

শিক্ষকরা স্কুল পালাতে পারে?

কথাটা ভেবেই হেসে ফেলল সে।

১৭

অগ্নি ব্রেকফাস্ট করছিলেন। মালতী চা নিয়ে এলেন।

অগ্নির সামনে বসে বললেন, "কী রান্না করব?"

অগ্নি বললেন, "আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? করো যেটা খুশি। বাজার আছে?"

মালতী বললেন, "মাছ এনো ওবেলা বেরিয়ে। আজকের মতো মাছ আছে।"

কলিং বেল বেজে উঠল। মালতী বললেন, "এখন আবার কে এল? দেখি।"

দরজা খুললেন মালতী। দেখলেন জিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বড়ো ব্যাগ।

বললেন, "কি রে? কী হল?"

জিনিয়া ব্যাগটা সোফার সামনে রেখে সোফায় বসে বলল, "যা আছে খেতে দাও। অফিস বেরোব।"

মালতী বললেন, "সে ঠিক আছে। এত বড়ো ব্যাগ নিয়ে এলি কেন?"

জিনিয়া বলল, "চলে এলাম। থাকব না ওখানে আর। পোষাল না।"

মালতী ছিটকে গিয়ে অগ্নির কাছে গিয়ে বললেন, "দেখলে? চলে এসেছে।"

অগ্নির খাওয়া হয়ে গেছিল। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিলেন না। হাত মুখ ধুয়ে টাওয়েলে হাত মুছে বললেন, "ও অফিস যাবে বলল তো। খেতে দাও।"

মালতী বললেন, "মানে? তুমি কিছু বলবে না?"

অগ্নি জিনিয়ার পাশে বসে বললেন, "খেতে দাও ওকে। ও একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে। ও যেটা ঠিক করবে, তাই হবে।"

মালতী বললেন, "আর বিয়ে হল, বাড়িতে অষ্টমঙ্গলায় জামাই এসে গেল, পাড়ার লোক জানল, আত্মীয়স্বজনরা জানল, তার কী হবে?"

অগ্নি জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "কী বলে দেখ তোর মা। নিজের মেয়ের থেকে এরাই বেশি হয়ে গেছে।"

জিনিয়া মার দিকে তাকাল, "তুমি কী চাও? বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?"

মালতী রেগে গিয়ে বললেন, "আমি কিছু চাই না। আমার চাওয়া না চাওয়ার তো কোনও দামই নেই। এত ভালো একটা ছেলে, তাও চলে এলি। যা পারিস কর।"

মালতী গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

অগ্নি জিনিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "ঝগড়া হয়েছে?"

জিনিয়া মাথা নাড়ল, "না। ঝগড়া হবে কেন? উদ্দালক খুবই ভালো ছেলে। ঝগড়া হবার মতো কিছু হয়নি।"

অগ্নি বললেন, "তবে?"

জিনিয়া বলল, "থাকব না জাস্ট, ঠিক করে ফেললাম। এটাই। থাকা হবে না আর কি।"

অগ্নি বললেন, "তাহলে কী করবি?"

জিনিয়া বলল, "যদি বাড়িতে থাকতে দাও, তাহলে বাড়ি থেকেই অফিস যাতায়াত করব। আর কিছু না।"

অগ্নি জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, "বেশ, তাই করিস। যেটা ইচ্ছা সেটা করিস।"

জিনিয়া বলল, "আর তুমি আমার বিয়েতে যা খরচ করেছ জানিয়ো, শোধ করে দেব সব।"

অগ্নি হেসে ফেললেন, "ধুর পাগল। ও তো তোরই টাকা। এসবের আবার হিসেব হয় নাকি? পাগল মেয়ে। যা, অনেকটা জার্নি করে এসেছিস। স্নান করে খেয়ে অফিস যা।"

জিনিয়া উঠে স্নানে গেল। স্নান করতে করতে কাঁদতে শুরু করল। কেন কাঁদছিল নিজেই বুঝতে পারল না। স্নান সেরে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগ থেকে সৌপ্তিকের ছবির

দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল। মালতী পাউরুটি আর অমলেট প্লেটে তার সামনে দিয়ে বসলেন।

জিনিয়া বলল, "মা এখন কোনও প্রশ্ন কোরো না প্লিজ। পরে কোরো।"

মালতী বললেন, "আমি কি তোর শত্রু মা?"

জিনিয়া বলল, "না। শত্রু হবে কেন? তবে বন্ধু হতে গিয়ে আমাকেই বুঝে উঠতে পারলে না কখনও।"

মালতী কেঁদে ফেললেন, "চিরকাল এই সংসারের জন্য খেটে আজ আমাকে এটা শুনতে হল।"

জিনিয়া আর কিছু বলল না। চুপ করে খেয়ে বেরিয়ে গেল।

অফিস করল সারাদিন কোনও কথা না বলে।

সুলগ্না কথা বলতে এসেছিল, সে বলল, "এখন যা। পরে কথা হবে।"

সন্ধে হলে অফিস থেকে বেরোল সে। সৌপ্তিকদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখল আলো জ্বলছে। ভাবল রাতে যে ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই এসেছেন হয়তো। বেল বাজাতে সৌম্য দরজা খুলল।

জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "আপনি? বাবা মা আসেননি?"

সৌম্য বলল, "না, আমি একা এসেছি। বাড়িটা সত্যিই বেচব এবার। ওদিকে একটা প্রপার্টি কেনার কথা চলছে। এ শহর থেকে পাততাড়ি গোটানোর সময় হয়ে গেল এবার।"

জিনিয়া বলল, "আপনার স্মৃতি? ভাইয়ের স্মৃতি? এসবের কোনও মূল্য নেই?"

সৌম্য হাসল, "আপনিও তো বিয়ে করে নিয়েছেন। আপনি মূল্য দিয়েছেন?"

জিনিয়া বলল, "বিয়ে করিনি সেভাবে, বিশ্বাস করুন। ইন ফ্যাক্ট আমি চলেও এসেছি ও বাড়ি ছেড়ে।"

সৌম্য বলল, "আপনি আসুন এবার। আমার গার্লফ্রেন্ড আসার কথা। ও আপনাকে দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। প্লিজ।"

জিনিয়া সৌপ্তিকের বাবার মোবাইলে চেষ্টা করল। ফোন অফ বলছে।

সৌম্য হাসিমুখে বলল, “নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে সবার। পাবেন না কাউকে। আসুন। নমস্কার।”

জিনিয়া স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরল।

এক লহমায় মাথাটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল তার।

১৮

সন্ধে হয়েছে। পল্টু পড়তে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, “বউদি নেই স্যার?”

উদ্দালক বলল, “না।”

পল্টু বলল, “অফিস গেছেন?”

উদ্দালক বলল, “তোর এত জেনে কী হবে? অঙ্ক খাতা খোল।”

পল্টু বলল, “ভাবলাম আজকেও দেশি মুরগি নিয়ে আসব।”

উদ্দালক বলল, "আজ ভাল্লাগছে না ওসব। আলুসেদ্ধ ভাত খাব।"

পল্টুর মুখটা নিভে গেল, "ওতে হবে?"

উদ্দালক বলল, "হবে। না হওয়ার কী আছে? দেখি খাতা দেখি।" পল্টু খাতা বের করে দিল। উদ্দালক পড়াতে শুরু করল। পড়ানো হয়ে গেলে পল্টু আর-একটু উশখুশ করল। উদ্দালক বলল, "তুই বাড়ি যা। আমার পড়া আছে আবার।"

পল্টু বিমর্ষ মুখে বলল, "বউদির দেরি হয়ে গেল।"

উদ্দালক বলল, "বউদি আসবে না। তুই বাড়ি যা।"

পল্টু মনখারাপ করে চলে গেল।

ইংরেজি কাগজের সুডোকু সলভ করতে বসল উদ্দালক। খানিকটা করে ভালো লাগল না। বই খুলে বসল। সেটাও ভালো না লাগায় উঠে গ্যাস জ্বালিয়ে ভাত আলুসেদ্ধ একসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে খেয়ে নিল।

বেডরুমে ঢুকল। তার ডায়েরিটা পড়ে আছে। খুলে দেখল জিনিয়া তার লেখার পরের পাতায় অনেকগুলো ছবি এঁকেছে। ফোন বাজল, দেখল জিনিয়ার মা ফোন করছেন। ধরল, "হ্যালো।"

মালতী নিচু গলায় বললেন, "বাবা, তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে?"

উদ্দালক বলল, "না তো। কেন বলুন তো?"

মালতী বললেন, "না মানে তিন্নি বলছে আর ফিরবে না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন একটা মান সম্মানের ব্যাপার বলো তো?"

উদ্দালক বলল, "কেন? মান সম্মানের ব্যাপার কেন? এখানে ওর পোষায়নি, চলে গেছে। মান সম্মানের কী হল?"

মালতী বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না বাবা কী কী সমস্যা হতে পারে? শুধু আমাদের কেন? তোমাদেরও সমস্যা হতে পারে।"

উদ্দালক একটু থমকে বলল, "ঠিক আছে। দুটো দিন যাক। দেখি আপনার মেয়ে কী করে। তারপর নাহয় কী করব ঠিক করা যাবে।"

মালতী বললেন, “দেখো কিন্তু। ওর বাবা এসব বুঝতে চায় না। আমি তো মা, আমার ভিতরেও তো অশান্তি হয় বলো? দ্যাখো, রাত সাড়ে নটা বাজে, এই একটু আগে বাড়িতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে চলে বলো তো? সমস্যা হয় না?”

উদ্দালক বলল, “সে অফিসের কাজ ছিল হয়তো। আচ্ছা আমি দেখছি ফোন করে।”

মালতী কাতর আর্তি করলেন, “দেখো বাবা। তুমিই পারবে।”

উদ্দালক হাসল, “না, আমি পারব না কিছুই। তবে দেখছি।”

ফোন রেখে উদ্দালক জিনিয়াকে ফোন করল। একবার পুরো রিং হয়ে কেটে গেল। দ্বিতীয়বার আবার রিং হতে জিনিয়া ধরল, “বলুন। আপনার কী চাই?”

উদ্দালক বলল, “কিছু চাই না। আপনার আঁকার হাত তো বেশ ভালো। ছবি আঁকেন আপনি?”

জিনিয়া থমকে গিয়ে বলল, “আপনি কোথায় দেখলেন?”

উদ্দালক বলল, “এই তো, আমার ডায়েরির পাতায়। বেশ ভালো ডিজাইনগুলো হয়েছে কিন্তু।”

জিনিয়া বলল, “আপনার আর কিছু বলার আছে?”

উদ্দালক বলল, “দেখুন, রুমমেট হিসেবে দুজন ছিলাম। একজন রুমমেট মেস ছেড়ে চলে গেছে। মাসি যা রান্না করেছে, তা এক্স্ট্রা হয়ে গেছে। আমি সেই খোঁজ নিতেই ফোন করলাম যে আমার রুমমেট ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছোতে পেরেছে কি না।”

জিনিয়া বলল, “পেরেছি। রাখুন। আমার ভালো লাগছে না কিছুই।”

উদ্দালক বলল, “আরে কেন ভালো লাগছে না বলবেন তো একবার।”

জিনিয়া চুপ করে গেল।

উদ্দালক বলল, “আরে বলুন। কী হল?”

জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকের দাদা এসেছে। ও বাড়ি বিক্রি করে দেবে।”

উদ্দালক বলল, “বেশ তো। আমি আর আপনি কিনে নেব। দুজনের মাইনেয় হাউজবিল্ডিং লোন পাওয়া যাবে তো। এই নিয়ে এত চাপ নেওয়ার কী আছে?”

জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, “মানে? আপনি কিনবেন কেন?”

উদ্দালক বলল, “আরে আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি আমার রুমমেট। তা ছাড়া কলকাতায় একটা বাড়ি হবে সেটাও মন্দ না। মাঝে মাঝে আমি, আপনি, পল্টু গিয়ে পিকনিক করে এলাম। খারাপ হবে ব্যাপারটা?”

জিনিয়া কেঁদে ফেলল। উদ্দালক বলল, “আরে, কাঁদছেন কেন? কী হল?”

জিনিয়া বলল, “থ্যাংক ইউ।”

উদ্দালক বলল, “ধুস। থ্যাংক ইউয়ের কিছু নেই। কাল আসুন দেখি ও বাড়ি। কথা বলি সৌপ্তিকের দাদার সঙ্গে। দেখি কী বলেন ভদ্রলোক।”

১৯

ভোরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পল্টুর সঙ্গে দেখা হল উদ্দালকের। পল্টু বাজারের ব্যাগ নিয়ে সাইকেলে চেপে যাচ্ছে। তাকে দেখে দাঁত বের করল, “কোথায় যাচ্ছেন স্যার?”

উদ্দালক বলল, “কলকাতা যাচ্ছি।”

পল্টু বলল, “বউদিকে আনতে?”

উদ্দালক শ্বাস ছাড়ল, “বউদিকে আনা ছাড়া কলকাতায় অনেক কাজ থাকে। তুই স্কুলে যাবি কিন্তু আজকে।”

পল্টু বলল, “আজ যাব না স্যার। আপনি যাবেন না, আমি গিয়ে কী করব?”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। তাহলে অঙ্কগুলো করবি।”

পল্টু ব্যাজার মুখে বলল, “করব। অঙ্কটা খুব বাজে জিনিস স্যার।”

উদ্দালক বলল, “তা ঠিক। খুবই বাজে জিনিস। পড়াশোনাটাও বাজে জিনিস। তবু করতে হয়। কী করবি?”

পল্টু বলল, “বনগাঁ লোকাল ধরবেন স্যার? খুব ভিড় হবে এখন।”

উদ্দালক বলল, “চিন্তা করিস না। ও ঠিক চলে যেতে পারব।” পল্টু সাইকেল নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল।

স্টেশনে পৌঁছে সুদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উদ্দালকের। শালি, বউ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। উদ্দালক সরাসরি সামনে গিয়ে দাঁড়াল, “কোথায় যাচ্ছেন?”

সুদেব এবার আর উত্তর না দিয়ে পারলেন না, “শ্বশুরবাড়ি। কাজ আছে।”

উদ্দালক বলল, “আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করছেন কেন স্যার?”

সুদেব হাসার চেষ্টা করলেন, “অ্যাভয়েড? না না তা কেন?”

উদ্দালক সুদেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। সুদেব পরিচয় করালেন। উদ্দালকের নাম শুনে সুদেবের স্ত্রীর মুখটা পানসে হয়ে গেল।

ট্রেন দেখা গেল। উদ্দালক বলল, “সাবধানে যান, আমি আসি? একদিন কিন্তু সস্ত্রীক বউদির হাতের চিংড়ির মালাইকারি খেতে যাব, কেমন?”

সুদেব হে হে করে কাটিয়ে গেলেন। উদ্দালক হেসে ফেলল। সুদেব সেটা বুঝে তার দিকে কটমট করে তাকালেন।

উদ্দালক আর সুদেবকে জ্বালাল না। সরে গেল। ট্রেন আসছে। এ পথে ট্রেনে ওঠাও যুদ্ধ করার সমতুল্য। সে প্রস্তুত হল।

#

সৌম্য উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বাড়িটা কিনবেন?"

উদ্দালক সৌম্যর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমি না ঠিক। আমরা। আমি আর ও দুজনেই। বিক্রি করবেন শুনলাম।"

সৌম্য বলল, "এ জায়গায় বাড়ির দাম অনেক হবে, অ্যাফোর্ড করতে পারবেন?"

উদ্দালক বলল, "করতে হবে। সৌপ্তিকের স্মৃতি আছে যখন। ঘটি বাটি বন্ধক রাখতে হলে রাখব।"

সৌম্য অবাক চোখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনিও কি জিনিয়ার মতো পাগল হয়ে গেলেন? আপনি বুঝতে পারছেন না মেয়েটা পাগল? মেন্টালি চ্যালেঞ্জড একটা মেয়ে?"

উদ্দালক বলল, “আমি পাগল হইনি। আর সাইকোলজিকাল স্টাডি বলছে কম বেশি আমরা সবাই পাগল। কারও পারসেন্টেজ বেশি। কারও কম। আপনি নিজেকেই দেখুন। প্রথমে ঠিক করলেন বাড়ি বেচবেন না। জিনিয়াকে চাবি দিয়ে গেলেন। পরে কী এমন হল যে সেটা বেচার কথা মাথায় এল? আমি বলছি কেন এল। যখনই আপনি জানতে পারলেন জিনিয়া মাঝে মাঝেই এ বাড়ি আসছে, আপনার ধারণা হল এই বাড়িটা হয়তো জিনিয়া দখল নেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনার সম্পত্তি বেদখল হওয়ার ভয় মাথায় এল। ঠিক বলছি তো?”

সৌম্য কয়েক সেকেন্ড উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, “বেদখল হবার কথা ভাবিনি, কিন্তু একটা মেয়ে যে বারবার আমার বাড়ি যাতায়াত করবে, সে ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে নিইনি।”

উদ্দালক বলল, “বেশ। আর-একটা কথা বলি আপনাকে। জিনিয়া সৌপ্তিককে ভালোবাসত। আজকাল ঠিকঠাক ভালোবাসার মানুষের বড়োই অভাব। জিনিয়ার মধ্যে সেটা নেই। ওর ভালোবাসায় কোনও ভেজাল ছিল না। তাই ও যেটা করেছে, তাতে পাগলামি সামান্য থাকতে পারে, বিন্দুমাত্র ধান্দাবাজি নেই। আর আপনার বাড়ি বেদখল হবার ভয়টাও নেই। বুঝেছেন?”

সৌম্য বলল, “আপনি জিনিয়াকে ভালোবাসেন, তাই না?”

উদ্দালক বলল, “নাহ। ভালোবেসে কিছু হয় না বুঝলেন? অর্ধেক বাঙালি ভালোবেসে কেরিয়র নষ্ট করল। মন দিয়ে কাজ করুন, প্রেম ভুলুন, দেখবেন অনেক ভালো থাকবেন। এই জিনিয়াকেই দেখুন, প্রেম প্রেম প্রেম করে মাথা খারাপ করে ফেলল। কী লাভ হল?”

সৌম্য বলল, “তাহলে বাড়ি কেনার কথা ভাবলেন কেন? অর্থনৈতিক ক্ষতি যেটা হবে, সেটা ভালো হবে?”

উদ্দালক বলল, “আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক লটারিতে এক কোটি টাকা পেয়ে আনন্দে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছিলেন। তার ছেলেরা সেই টাকা ভাগাভাগি করে নিল। দু বছরের মাথায় সব টাকা উড়িয়ে যা অবস্থা ছিল, তার থেকেও খারাপ অবস্থা হয়ে গেল তাদের। টাকা দিয়ে কী হবে? হোম লোন নিলে একটা বড়ো অঙ্কের হাউজ বিল্ডিং লোন মাইনে থেকে কেটে যাবে। এই তো? কষ্ট করে থাকতে হবে, সপ্তাহে চারদিন মাংস খাই, তার জায়গায় দুদিন খাব। এর বাইরে আর কী হবে? চাপ নেবেন না। আপনি বলুন কত টাকায় বেচবেন বাড়ি। আমরা কিনে নেব।”

সৌম্য মাথা নেড়ে হেসে বলল, “বাঙালি মাত্রেই ইমোশনাল ফুল।”

উদ্দালক বলল, “আপনি বাঙালি নন? আপনার ইমোশন নেই? দাঁড়ান, এক মিনিট।”

মোবাইল বের করল উদ্দালক। গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে সৌম্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা মনে হয় আপনাদের দুই ভাইয়ের ছবি, তাই না? এ বাড়ি তখন হচ্ছে সম্ভবত, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে ইট দেখা যাচ্ছে। প্লাস্টার হয়নি। জমি, ইট, সিমেন্ট সবই বাজারে পাওয়া যায় সৌম্যবাবু, কিন্তু এই স্মৃতিটা কি পাওয়া যাবে?"

সৌম্য মোবাইলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

উদ্দালক বলল, "এবার সোয়াইপ করুন মোবাইলটা। পরের ছবিতে যান। দেখুন, জিনিয়া আমার ডায়েরিতে আপনাদের এই বাড়ির ছবিটাই এঁকেছে। একটা মেয়ে তার প্রেমিককে কতটা ভালোবাসলে তাকে এভাবে আত্মস্থ করতে পারে বলুন তো? ইমোশনাল ফুল? হলই বা, তাতে কি আদৌ কিছু আসে যায়?"

সৌম্য মাথা নিচু করল।

উদ্দালক বলল, "বাড়িটার জন্য কত দাম ঠিক করলেন জানাবেন সৌম্যবাবু। এ বাড়িটা আমরাই কিনব। আপনি আসতে পারেন নিজের ছোটোবেলার বাড়ি দেখতে। চিন্তা নেই, আমরা বাধা দেব না। আসি।"

উদ্দালক উঠল। সৌম্য আর কোনও কথা বলতে পারল না।

২০

ব্যাংকে লোনের কাগজপত্রে সইসাবুদ সেরে বেরিয়ে উদ্দালক বলল, "শরবত খেতে ইচ্ছা করছে। খাবেন নাকি?"

জিনিয়া বলল, "চলুন।"

উদ্দালক বলল, "প্যারামাউন্ট যাব। চলুন মেট্রো ধরি।"

দুজনে মেট্রোতে এম জি রোডে নেমে হাঁটতে শুরু করল। উদ্দালক বলল, "কলেজলাইফে প্রচুর বই কিনতে আসতাম এখানে। পড়ার বইয়ের বেশি থেকে একগাদা লিটল ম্যাগ আর গল্পের বই কিনে ফিরতাম। ফুট থেকে বই কিনেছি। কত বিখ্যাত লেখকের সই ছিল সেসব বইতে। রদ্দির দামে বেচে দিয়েছে কেউ। সে জিনিস আবার রিসাইকেল হয়ে কলেজ স্ট্রিটেই বিক্রি হয়ে অন্য কোনও বইপ্রেমী কিনেছেন। মানুষের কাছে নস্টালজিয়ার মূল্য খুব সীমিত। মূল্যবোধও। নইলে বাবা-মাকে কেউ বৃদ্ধাশ্রমে দিতে পারে?"

জিনিয়া বলল, "আপনি সৌম্যকে এমন কী বললেন যাতে ও বাড়িটা আমাদেরই বেচতে রাজি হয়ে গেল?"

উদ্দালক হেসে বলল, “বলেছি কিছু একটা। এখন মনে করতে পারছি না। কেন বলুন তো?”

জিনিয়া বলল, “এত টাকা ইএমআই দিতে পারব?”

উদ্দালক বলল, “দিতে হবেই। মানুষের বেঁচে থাকতে কী এমন টাকা লাগে? হয়ে যাবে। আর গাড়ি-টাড়ি তো এ জন্মে কিনতাম না। সাইকেলেই প্রকৃতির জন্য বেস্ট। কোনও এমিশন নেই, পরিবেশে কোনও দূষণও নেই। ও নিয়ে ভাববেন না। তা ছাড়া বিদেশ যাব বলে অনেক টাকা জমিয়েছি। সবসময় তো স্কলারশিপের ভরসায় থাকা যায় না। আছে কিছু টাকা। অসুবিধা হবে না।”

জিনিয়া বলল, “আপনি কেন টাকা দিতে যাবেন?”

উদ্দালক বলল, “আপনার জন্য ভাববেন না। আমারও নিজের দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। বিদেশের ছাত্র পড়িয়ে ডলারে না কামিয়ে নাহয় দেশের অগাবগা ছাত্রদের মানুষ করি। দেখি পারি কি না। দিনের শেষে সাইকেল চালিয়ে আলের ধার দিয়ে ঘরে ফেরা, রাত্তিরে মাস্টার ছাত্র মিলে রান্না করে খাওয়া, এসব লাইফ ছেড়ে কে যাবে বলুন তো বাইরে? আমাকে কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে নাকি?”

জিনিয়া বলল, “আমি বুঝেছি।”

উদ্দালক বলল, “কী বুঝেছেন?”

জিনিয়া বলল, “আমার মতো আপনার হেড অফিসেও স্ক্রু ঢিলা আছে।”

উদ্দালক বলল, “তা আছে। সুস্থ মানুষ হয়ে মানুষে মানুষে দাঙ্গা করার থেকে মনে হয় দু-চারটে ঢিলা স্ক্রু নিয়ে কিছু মানুষের কাজে আসা ভালো। আপনার কী মনে হয়?”

জিনিয়া বলল, “আমার কিছু মনে হয় না। আমি মনে হয় ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাব।”

উদ্দালক বলল, “ধুস। পাগল হতে যাবেন কেন? ভালো কাজ করলে কেউ পাগল হয় না। সৌপ্তিকের বাড়িটা ভালো কোনও কাজে লাগানো যেতে পারে। পথশিশুদের আশ্রয়স্থল করা যেতে পারে। তাতে কি সৌপ্তিক খুব একটা দুঃখিত হবে? মনে হয় না।”

জিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, “সেটা তো ভাবিনি। এরকম করলে সত্যি খুব ভালো ব্যাপার হবে।”

উদ্দালক বলল, “বাড়িটার নামও একটা ভেবে রেখেছি। আপনার চরিত্রের সঙ্গে খুব যাবে।”

জিনিয়া বলল, “কী?”

উদ্দালক হাসল, “অপরাজিতা।”

জিনিয়া বলল, “সত্যি এখন ভাবলেন? না আগে থেকে ভেবেছিলেন?”

উদ্দালক বলল, “না, এখনই ভাবলাম। যদিও আপনার নামটাও ফুলের নামেই, তবু আপনি অপরাজিতাই বটে। সৌপ্তিক ভাগ্যবান।”

জিনিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

উদ্দালক বলল, “ডাবের শরবত খেয়ে কবিরাজি কাটলেট খাব বুঝলেন? তারপর আরও কিছু বই কিনব। একটা ব্যাগও কিনতে হবে বইগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। আহ, কলেজ স্ট্রিট! মানুষের যাওয়া আসা, বইয়ের গন্ধ, হাতে টানা রিকশা... মনে হয় কোনও স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। কলকাতাকে বোধহয় দূরে থেকেই বেশি ভালোবাসা যায়।”

জিনিয়া বলল, “কলকাতা বড়ো কষ্টও দেয়।”

উদ্দালক বলল, “আর সেই কষ্টকে ভুলতেও সাহায্য করে। পল্টুকে একদিন নিয়ে আসতে হবে। ব্যাটা প্যারামাউন্টে এলে সাত আট গ্লাস শরবতের নিচে থামবে না মনে

হয়। অনেক জায়গা ঘোরার আছে। এক কাজ করব, স্কুল থেকে এবার শীত পড়লে এক্সকারশন করব। জমে যাবে। দেখি, গিয়েই হেড়ুকে ধরব। আচ্ছা, আমি তো আজকে চলে যাব। আপনি ভাববেন না, ইএমআইয়ের টাকা ঠিক পাঠিয়ে দেব প্রতি মাসে। চিন্তার কিছু নেই।"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে।"

উদ্দালক একটা বইয়ের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে গেল, "ইরিব্বাস! সতীনাথ ভাদুড়ির বই। এই আপনি একটু দাঁড়ান, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উদ্দালক বইয়ের দোকানের ভেতর প্রবেশ করল।

২১

দুদিন পরের কথা।

রাত আটটা। পল্টু পড়তে বসেছে। আশ্চর্যজনকভাবে সব অঙ্কই ঠিক করছে। উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কি রে পল্টু, তুই তো কামাল করে দিচ্ছিস রে ব্যাটা, এই কঠিন অঙ্কগুলোও পারছিস কী করে?"

পল্টু দাঁত বের করে বলল, “প্যাকটিস করছি স্যার। অঙ্কগুলো আজকাল আর আগের মতো কঠিন লাগে না।”

উদ্দালক খুশি হয়ে বলল, “তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। আজ তাহলে মাংস হয়ে যাক। কী বলিস?”

পল্টু হাসল, “হ্যাঁ স্যার। হয়ে যাক।”

উদ্দালক মানিব্যাগ নিতে উঠল। পল্টু জিজ্ঞেস করল, “স্যার, বউদি আর আসবেন না?”

উদ্দালক বলল, “না। বউদির বাড়ি তো কলকাতায়। উনি ওখানেই থাকবেন।”

পল্টু বলল, “এরকম হয় নাকি? বিয়ের পর তো বউ বরের সঙ্গে থাকে।”

উদ্দালক বলল, “হয়, কলকাতায় হলে এরকম হয়।”

পল্টু বলল, “কী যে বলেন স্যার, বিনোদের বাবা তো মেয়েটাকে কথা দিল বিনোদ বড়ো হলেই বিয়ে দিয়ে মেয়েকে ঘরে তুলবে। তাহলে আপনার বউ দূরে থাকবে কেন?”

উদ্দালক বলল, "খুব পেকেছিস ব্যাটা। যা, মুরগি নিয়ে আয়। আমি পেঁয়াজ কাটতে বসি।"

পল্টু মুখ কালো করে বেরোল।

উদ্দালক পেঁয়াজ কাটতে বসল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই লাফাতে লাফাতে পল্টু এসে বলল, "স্যার, স্যার, বউদি এসেছেন।"

উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কী? ইয়ার্কি মারছিস?"

পল্টু বলল, "হ্যাঁ স্যার। এই তো।"

উদ্দালক ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল জিনিয়া টোটো থেকে নামছে। দোতলা থেকে সদাশিববাবু আবার উঁকি দিয়ে সেটা দেখছেন। সে বাইরে আর কিছু বলল না।

জিনিয়া ব্যাগ নিয়ে ঢুকল। পল্টুকে বলল, "তোর জন্য কলকাতার ভালো মিষ্টি নিয়ে এলাম পল্টু। তুই কোথায় যাচ্ছিলি এখন?"

পল্টু বলল, “মাংস আনতে।”

জিনিয়া বলল, “তাই নাকি? তা কটা রুটি খাবি বল? রুটি করে ফেলি শিগগিরি।”

পল্টু বলল, “আজ তো বেশি খুশি। তাই আজ পনেরোটা খাব।”

জিনিয়া হাসতে হাসতে বলল, “তাই হবে।”

পল্টু লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

জিনিয়া উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, “কী ব্যাপার? আপনি মনে হচ্ছে একবারেই খুশি হননি?”

উদ্দালক বলল, “না, ঠিক তা নয়। আপনি বলতে পারতেন আমাকে। আমি স্টেশনে আনতে যেতাম নাহয়।”

জিনিয়া বলল, “বাড়িটা ঠিক পোষাচ্ছে না বুঝলেন। মা সারাক্ষণ এমন মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন আমি মরে গেছি। ওরকম করলে থাকা যায়! তার উপর আপনার মাও ফোন করছেন। এত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তা ছাড়া সৌপ্তিকদের বাড়িতে ঠিক কী করতে হবে, সে প্ল্যানটাও তো বসে করতে হবে। আপনি চিন্তা করবেন

না। আপনাকে আমি জ্বালাতন করব না। আপনি পড়ুন। মন দিয়ে পড়ে যান। আমি আমার মতোই থাকব, ঠিক যেমন কথা হয়েছিল। ভালোবাসাটা সৌপ্তিকেরই থাক। আমরা সারাজীবন নাহয় বন্ধু হয়ে থাকি। দেখি, আটা কোথায়, আটা মাখি। পল্টুর জন্য রুটি করে রাখি।"

উদ্দালক বলল, "না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আটা মেখে দিচ্ছি। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন।"

জিনিয়া বলল, "স্টেশনে নেমেই আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি। এখানকার হাওয়াটাই আলাদা। একফোঁটা পলিউশন নেই।"

উদ্দালক হাসল, "তা ঠিক।"

জিনিয়া বলল, "আচ্ছা শুনুন।"

উদ্দালক বলল, "বলুন।"

জিনিয়া বলল, "আপনার আসল ডায়েরিটা আমাকে দেবেন? আমি পড়তে চাই।"

উদ্দালক বলল, "কী করবেন পড়ে?"

জিনিয়া বলল, "সময় কাটাব। কী আর করব?"

উদ্দালক বলল, "প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি পড়ুন। বেশি ভালো লাগবে।"

জিনিয়া বলল, "আপনি দেবেন না, তাই তো?"

উদ্দালক বলল, "ব্যাগটা ঘরে রেখে ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি পেঁয়াজ কেটে রেডি করি সব।"

জিনিয়া বলল, "কথা ঘুরিয়ে দিলেন অমনি?"

উদ্দালক বলল, "ডায়েরি লিখি না আমি। ডায়েরি লিখে কী হবে? স্মৃতি লিখে রাখা? হয় না জাস্ট। সব মোমবাতিই জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায় একদিন। মোমের যে অংশ বাতাসে মিশে যায়, আমাদের জীবনটাও সেরকম। চলে যাওয়ার পর এখানেই মিশে থাকব, কেউ মনে রাখবে। কেউ ভুলে যাবে। লিখে কী হবে?"

জিনিয়া চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "আপনি বড়ো ভারী ভারী কথা বলেন। এরকম কঠিন কথা না বলে বোঝানো যায় না?"

উদ্দালক বলল, "সে বোঝানো যায়। তার জন্য আরও পড়াশোনা করতে হবে। যত জানব, তত সহজ হবে চারপাশ। যত কম জানব, তত কঠিন হবে সব কিছু।"

পল্টু লাফাতে লাফাতে মাংস নিয়ে ঢুকল। বলল, "স্যার, বাবা বলেছে কাল আমাদের বাড়ি খেতে। ভেটকি মাছ আনাবে।"

উদ্দালক বলল, "বাহ। এ তো দারুণ খবর রে।"

জিনিয়া উঠল, "ব্যাগটা রেখে এসে রুটি করি তোর পল্টু। দাঁড়া, এখনই আসছি।"

পল্টু বলল, "তাড়াতাড়ি আসুন বউদি। মাছ ধরার গল্প বলব। বড়ো পুকুরে ইয়াব্বড়ো কাতলা ধরলাম কালকে।"

"আচ্ছা, শুনব রে বাবা শুনব", বলে হাসতে হাসতে ব্যাগ নিয়ে বেডরুমে ঢুকল জিনিয়া।

ঘর অন্ধকার ছিল। আলো জ্বালল সে।

খাট জুড়ে ঝলমল করছে নীল কাগজ দিয়ে বানানো একগাদা অপরাজিতা ফুল...